BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

হৃদয়বৃত্তান্ত

হৃদয়বৃত্তান্ত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ প্রকাশন

প্রকাশক
হঠাৎ প্রকাশন
৩৮, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
১৯৯৯ইং

মূল্য ঃ ৫০ টাকা, মাত্র

ধামাখালিতে বাস থামতেই দুই মূর্তিমান লাফিয়ে নামল। রতন আর বাসু। নেমেই তোতনকে ডাকাডাকি, দাদা, নামবেন না? নেতাজী সুইটসে গরম সিঙ্গারা, সন্দেশ, ফার্স্ট ক্লাস ভেজিটেবল চপ----

বাসের সীটে অনড় বসা তোতন শিউরে উঠল। কুকিং মিডিয়ম, ডিশ, কাপ সবকিছু সম্পর্কেই তার ঘোরতর সন্দেহ আছে। জীবাণু থিকথিক করে এসব দোকান পাটে। আর দোকানের চেহারাও মোটেই সুবিধের নয়। জানালা দিয়ে উল্টোদিকে ওই তো দেখা যাচ্ছে নেতাজী সুইটস্। থিকথিক করছে ক্ষুধার্ত জনগণে। লুঙ্গি পরা, প্যান্ট পরা, পাজামা পরা, টেরিকটন পরা, খদ্দর পরা, কালো, তামাটে, রোগা, মোটা নানান রকমের জনগণ। কে কোন রোগে ভুগছে কে জানে! বুকের দোষ, খুজলি, এডস্, পায়োরিয়া কত কী থাকতে পারে। আছেই। বালতির জলে খপাত খপাত করে চুবিয়ে এঁটো কাপপ্লেট নামমাত্র ধুয়ে তুলছে একটা বছর দশবারোর ছেলে। তার বেশি করার সময় নেই। জনগন হামলে পড়ছে, বাস বেশীক্ষণ দাঁড়াবে না। মস্ত কড়াইয়ে সিঙ্গারা নাচছে ডুবতেলে। চারদিকে বনস্পতির গন্ধ।

তোতন সুন্দর অভিনয় করল। চোখ বড় করে তাতে রাজ্যের বিস্ময় ঢেলে বলল, আমার তো মোটেই খিদে পায়নি! এই তো খেয়ে বেরোলাম!

রতন বলল, সে তো তিন ঘন্টা আগে।

মিষ্টি হাসল তোতন, আমার অত ঘন ঘন খিদে পায় না। তোমরা খেয়ে এসো।

দুজনেই একটু মুখ তাকাতাকি করে। তোতনকে ফেলে খাওয়া উচিত হবে কিনা কিংবা কতটা দৃষ্টিকটু দেখাবে! মান্যগণ্য লোক!

তোতন অভয় দিলে,অসময়ে আমি কিছু খাই না।

রতন কাচুমাচু হয়ে বলে অনেকটা পথ যে বাকি।

তা হোক।

একটু মুড়িটুড়ি এনে দিই না!

মুড়ি শুনে নাক কোঁচকায় তোতন। একটু ভাবে। তার অভিনয় যতই ভাল হোক, খিদে তেষ্টা তারও আছে। কিন্তু মুড়িও আসবে অবধারিত খবরের কাগজের ঠোঙায়। তাতে লেড পয়জনিং হতে পারে ছাপার কালি থেকে, আর কাগজটা সম্পর্কে তো স্থায়ী সন্দেহ আছেই। হয়তো নোংরা আবর্জনায় পড়ে থাকা ময়লা কাগজেই বানিয়েছে। এদেশের লোককে সে বাল্যাবধি হাড়ে হাড়ে চেনে। মাথা নেড়ে বলে, দরকার নেই।

বাস ভর্তি জনগণের অর্ধেকেই নেমেছে উর্দ্ধশ্বাসে খেয়ে নিতে। তোতন তার জানালার ধারের সীটটায় সেঁটে বসে রইল। কলকাতা থেকে একভাবে বসে আছে। হাঁটু ধরে গেছে, পিঠ ব্যথা করছে। একটু নামলেও হয়।কিন্তু ইচ্ছে করছে না।একটু বাদে নামতে তো হবেই। ঘাট বেশী দূরে নয়।না নামবার আরও একটা কারণ আছে। কারণটা সামনের সীটে বসে আছে। তোতন যেমন জানালার ধারে মেয়েটা তেমনি আবার জানালার ধারে নয়। ফলে একটু ঘাড় ঘোরালেই তোতনের সঙ্গে চোখাচোখি। এই চোখাচোখি কলকাতা থেকে এই এতটা অবধি হয়ে হয়ে আসছে। সঙ্গে ক্ষীণ একটু আধটু হাসির রেখা। কালো হলেও মেয়েটা ভুলো কারো নয়। ঠোঁট দুটি একটু পুরু টসটসে, মুখখানার ডৌল চমৎকার। সতেরো আঠেরো বছরের অবিমৃষ্যকারী যৌবন এখন যাকে পায় তাকে চায়। সেই চোখেই মেয়েটা এতক্ষণ ছোবল মারছে তাকে। পাশে তার ঘোমটা-টানা মা। কয়েকবার কথা বলতে ইচ্ছে হয়েছে তোতনের কিন্তু ছুতো খুঁজে পায়নি। গেঁয়ো মেয়েটা তো আগ বাড়িয়ে কিছুতেই কথা বলবে না। নিয়ম নেই যে! তবে চোখও কিছু কম কথা কয় না। এ মেয়েটার চোখ কি কিছু বলেছে তাকে?

বাস ফাঁকা বাইরে তাকানোর ভান করে ঘাড় সামান্য ঘুরিয়ে মেয়েটা একদৃষ্টে দেখছে তাকে অকপটে তোতনও দেখছে। সম্পর্কটা একটু পরেই শেষ হয়ে যাবে দুজনেই তা জানে। দ্রুত তবু সম্পর্কের একটা জাল তবে কেন রচনা করে চলেছে তারা?

দাদা ... নামবেন? জানালার বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করছে রতন।

না, আমি পান খাইনা।

এক কাপ চাও নয়?

না। আমার জন্য ভেবো না।

বড় ম্লান হয়ে গেল রতন। এই মান্যগণ্য লোকটিকে ফেলে তারা যে খাবার খাচ্ছে, চা গিলছে, পান চিবোচ্ছে এটা তার সুবিধের ঠেকছে না। অপরাধ হয়ে যাচ্ছে যে! কিন্তু বেশী চাপাচাপিও করতে পারছে না। ততটা সাহস নেই। মান্যগণ্য লোকদের মেজাজ মর্জি বুঝে চলতে হবে তো!

মেয়েটা তার মায়ের সঙ্গে নিচু স্বরে কী কথা বলে নিল। তারপরেই মুখ তুলে তীব্র কটাক্ষ। তোতন তাকে দেখছে কিনা। না দেখলে মেয়েটার মন খারাপ হবে নিশ্চিত। অপমান বোধ করবে। সতেরোর কিশোরী সবসময়েই চায় পুরুষের চোখে যাচাই হতে। তোতন প্রাণপণে এই কর্তব্যটা সমাধা করছে। তার খারাপও লাগছে না। কিন্তু মার খেয়ে যাচ্ছে বাইরের প্রকৃতি এবং দৃশ্যাবলী। সেসবের দিকে আর তাকাতে পারছে কই!

ধীরে সুস্থে প্যাসেনজাররা উঠে আসছে বাসে। যতগুলো নেমেছিল ততগুলো শেষ অবধি উঠল না। ধামাখালি বোধহয় বেশ গুরুতর জায়গা। অনেকেই নেমে গেছে।

জর্দার গন্ধ ছড়িয়ে তোতনের পাশের লোকটা এসে বসল এবং তোতনের কোলের ওপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জানালা দিয়ে পিক ফেলল। একবারে হবে না আরও কয়েকবার ফেলবে তা বুঝে উঠতে পারছে না তোতন। তবে এ এক জ্বালা।

তার পাশে বসলে স্পর্ধার সামিল হবে বিবেচনা করে রতন আর বাসু বসেছে একেবারে পিছনের লম্বা সীটে। তোতন খানিকটা একা। কথা বলার লোক নেই। মেয়েটা ছিল বলে রাস্তাটা কেটে গেল।

দুধারে মাছের ভেরি মাঝখান দিয়ে ধামাখালি বাজার থেকে ঘাট অবধি যে রাস্তা গেছে তা বেশ উদোম, খোলামেলা। আকাশ বহু দূর অবধি দেখা যায়। আনতনে একটু বাইরে তাকিয়েছিল তোতন, কনুইয়ের চুড়ির শব্দে খেয়াল হল। মেয়েটা পছন্দ করছে না তার এই বাইরে তাকানো। পথ তো আর বেশী নয়। এবার ছাড়াছাড়ি হওয়ার পালা। এ সময়টুকু নষ্ট করতে আছে?

ঠিকই তো। তোতন সুতরাং বাইরে থেকে তার চোখ প্রত্যাহার করে নিবেদন করল সতেরো বছরের যৌবনকে।

রাস্তাটা সেভাবেই ফুরোলো। এক পরিণতিহীন শুভদৃষ্টিতে।

কোনও কোনও জায়গা আছে যেখানে পা দিলেই পূর্বজন্মের কথা মনে আসে যেন। মনে হয়, এ জন্মে নয়, আর জন্মে কখনও এখানে ছিলুম। আরশাদ মিঞার ঘাটে বাস থেকে নেমে মাথার মধ্যে চলকে উঠল স্মৃতি। কখনও আসেনি এখানে। তবু কেন এরকম চেনা-চেনা মনে হচ্ছে তার!

মলিন দুটি নাইলনের বাজার ব্যাগ আর বেতের হ্যাণ্ডেলওয়ালা চুবড়ি নিয়ে সেই কিশোরী আর তার মা নামল সামনের দরজা দিয়ে। মেয়েটাকে এই প্রথম মুখোমুখি দেখল তোতন। পিছন থেকে আর পাশ থেকে যতটা ভাল দেখাচ্ছিল, মুখোমুখি ততটা নয়। আর এই উজ্জ্বল দুপুরের রোদে সাদাটে টপভূমিতে কেমন বেঁটে, তুচ্ছ, কালোও দেখল নাকি? মেয়েটা তৃষিতের মতো কয়েক পলক চেয়ে রইল তোতনের দিকে। তোতনও। তবে এখন আর ক্রিটিকের চোখ, প্রেমিকের নয়, পূজারীরও নয়। ন্যাড়া উদোম বালিয়াড়ি ধরে ঘাটের দিকে আরও মানুষের পিছু পিছু চলে গেল তারা। হারিয়ে গেল, চারিদিনের মতো, তোতনের কাছে। ট্র্যাজিক এন্ড।

জায়গাটা কি আহামরি কিছু! কে জানে! তবে নদী আছে, নদীর ধারের আবহমানকালের উদাসী হাওয়া আছে, আছে মন-কেমন-করা দিগন্ত। সব মিলিয়ে একটা সিনথেসিস যা কেবলই জন্মান্তরের দরজা খুলবার জন্য চাবি খুঁজছে।

তোতন কি এক জন্মেই শেষ! কই না তো! ধামাখালির এই ঘাটে খাড়া রোদে দাঁড়িয়ে তার হঠাৎ কেন মনে হয় জন্মজন্মান্তরে দাঁড়িয়ে আছে সে!

দমড়ার বেড়া আর টিনের চালের যে দোকানঘরগুলো প্রায় সর্বত্র নদীর ঘাটে দেখা যায় তারই একটার সামনে, খোলা জায়গায় পাতা বেঞ্চ রুমালে ঝেড়ে দিয়ে রতন বলে, দাদা, একটু বসুন। আমরা আসছি।

বিরক্ত তোতন বলে, আবার কে,থায় যাও?

এই এলুম বলে। ততক্ষণে একটা ডবল হাফ চা --

সবেগে মাথা নেড়ে তোতন বলে,কক্ষণো নয়।

দুই মূর্তিমানইবাদা অঞ্চলের মাটামারা লোক, বাস থেকে নেমেই পায়জামা একটু তুলে কোমরে গুঁজেছে। তোতনের মস্ত চামড়রা ব্যাগটা রতনের কাঁধে। তোতনকে এখন অবধি বইতে দেয়নি। ওই ঝা-চকচকে দেখনধারী ব্যাগখানা এখন রতনের প্রেস্টিজের জিনিস। তোতন "ব্যাগটা রেখে যাও না" বলাতে সবেগে মাথা নেড়ে বলে উঠল, "না না কি যে বলেন।" তারপরই দুই মূর্তিমান দুদিকে ছুট লাগাল।

শরৎ এল বলে। তবু গরম এখনও আছে। রোদে বসলে ঘাম হয়। কিন্তু তোতন গরম তেমন টের পাচ্ছে না। নদীর হুড় হাওয়া এসে হিলিবিলি কেটে যাচ্ছে চলে। এলোমেলো করে দিচ্ছে মাথা। চলকে উঠছে স্মৃতি। ক্রিটিক্যাল সে জায়গাটাকে আর দেখছে না। দেখছে ঘুম-ঘুম, রহস্যময় গভীর এক চোখে।

এখানে কি কোনও জন্মে ছিল তোতন?

আধঘন্টা পরে বাঁধের মতো উঁচু উদোম জায়গাটা দিয়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে রতনকে আসতে দেখা গেল। কাছে এসে হাপসানো গলায় বলে, নাঃ পাওয়া গেল না। আজ আবার পরব আছে।

কী পাওয়া গেল না রতন?

কাঁচুমাচু মুখ করে রতন বলল ভেবেছিলুম একটা রিজার্ভ করা ভটভটিতে নিয়ে যাবো। তা সুবিধে হল না। দেখা যাক আরশাদ মিঞার ঘাটে যদি বাসুটা পায়।

রিজার্ভ করা! সেটা আবার কী? রিজার্ভ করার দরকার কী?

রতন খুব বোকা-বোকা হেসে বলে, ভাবলুম আজেবাজে লোকের ভীড়ে না গিয়ে বেশ ফাঁকা ভটভটিতে নিজের মতো যেতেন।

সেইজন্য সময় নষ্ট করছ?

তোতন রেগে যেতে পারত। কিন্তু ধামাখালির ঘাটে তার পূর্বজন্ম ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে ততটা রাগ হল না। এই অঞ্চলের লোকের কোনও সময়জ্ঞান নেই, তাড়া নেই। সময়মতো কোথাও পৌঁছোতে হবে—এই বোধটাই নেই।

তোতন উঠে পড়ে বলল, পাগল নাকি! বাসেও তো দিব্যি পাঁচজনের সঙ্গে এলাম, রিজার্ভ করতে হয়নি তো। তাহলে ভটভটিই বা রিজার্ভ করতে হবে কেন? চল, চল।

ঘাটের নাবাল থেকে উঠে দূর থেকে বাসু চেঁচিয়ে হাত নেড়ে জানাল, কী যেন পাওয়া যায়নি।

এদের কথা শুনে চললে আরও বিপাকে পড়তে হবে, তোতন তাই রতনের দিকে দৃকপাত না করে ঘাটের দিকে দ্রুত হাঁটতে লাগল।

আরশাদ মিঞার ঘাটে বন্দোবস্ত ভাল। ভাঁটিতে জল নেমে গেলেও কাদা মাড়াতে হয় না। বড় বড় কংক্রিটের চাঁই পাতা ইছে। তোতন নিজেই পারত, তবু দুই মূর্তিমান দু'দিকে কাদায় নেমে তার হাত ধরে ফেলল দু'দিক থেকে। তাদের হাওয়াই চটি এক হাতে ধরা।

ভটভটি ঘন ঘন আসে যায়। শেষ কংক্রিটের ওপর পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই এসে গেল একটা। আধঘন্টা আগে হলে সেই মেয়েটার সঙ্গে একই ভটভটিতে যেতে পারত হয়তো। দুই আহাম্মক তো আর সেটা জানে না!

কেই কোথাও ছিল না, কিন্তু ভটভটি ভিড়তেই যেন হাওয়া বাতাস থেকে সাত আটটা মানুষ উড়ে এল এবং চটপট উঠে পড়ল নৌকায়। তোতনকে উঠবার সুযোগই দিল না দুজনে, চ্যাংদোলা করে তুলে ফেলল। তারপরই লোকজনকে খামোখা ধমক চমক "সরে যান সরে যান, দাদাকে বসতে দিন।"ওদের বাধা দিলে গণ্ডগোল আরও পাকিয়ে তুলবে ভয়ে তোতন কিছু বলল না। ছইয়ের নিচে বাবু হয়ে বসে একদিকে চেয়ে রইল।

দিশি নৌকোয় পাম্পসেট লাগিয়ে এই যে বিচিত্র জলযান তৈরি হয়েছে দেশে-বিদেশে এরকমটি দেখা যাবে বলে মনে হল না তোতনের। পাম্পসেট বিকট শব্দে প্রচুর ডিজেল পুড়িয়ে এবং ধোঁয়া উড়িয়ে নৌকোয় যে গতি সঞ্চার করে তা স্টিমার বা স্পীডবোটের তুলনায় গরুর গাড়ি। শুধু কষ্ট করে

বৈঠে মারতে হয় না এই যা। শব্দে মাথা ধরে গেল এবং নদীর ধারের প্রকৃতি ফের মার খেল তোতনের চোখে। ভাল করে দেখল না কিছু। এখন তার খিদে পেয়েছে, ঘাম হচ্ছে, সামনে নৌকোর পাটায় দাঁড়ানো কিছু বেকুব লোক হাওয়া চলাচলের পথ বন্ধ করেছে। তবু খুব একটা রেগে যাচ্ছে না তোতন, যতটা লাগা উচিত ততটা খারাপও লাগছে না। সে কি শর্মিষ্ঠার জন্য?

না, তা নয়। আজকাল তাকে এক নির্বিকারত্ব পেয়ে বসেছে। একটু উদাসীনতাও। আজকাল সে সাধু-সন্যাসী হওয়ার কথা ভাবে। আর মাঝে মাঝে বিষণ্ণতায় ভরে থাকে মন। নিঃসঙ্গ লাগে, আবার নিঃসঙ্গতাই ভাল লাগতে থাকে। ভাল বিষণ্ণও কি লাগে না? খুব দীন হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। খুব নিরহংকার হয়ে। খুব বিনয়ী হতে ইচ্ছে যায়। খুব গরিব ও মহৎ হতেও। এসব মিশিয়ে একটা ককটেল করলে কেমন হবে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই তার।

ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে লোক নামিয়ে এবং তুলে, বড় নদী ছেড়ে, ছোটো নদী ধরে ভটভটি এগোচ্ছে শব্দের সন্ত্রাস ছড়াতে ছড়াতে। আমরা কোথায় নাববো রতন?

আজ্ঞে হাবিলি ঘাট। সেখানে ভ্যানগাড়ি রাখা আছে। পাকা রাস্তা। হ্যাঁ, হাবিলি ঘাট নামটা কয়েকবার শুনেছে বটে তোতন ওদেরই মুখে। সেখানে নেমে কোরাকাঠি অল্প একটু হাঁটাপথ। অল্প মানে কত? রতনের মতে আধঘন্টা বা মেরেকেটে পঁয়ত্রিশ মিনিট। বাসুর মতে, তা মিনিট দশেক লাগতে পারে। এদের কারোই যে সম্পর্ক কোনও বোধ গজায়নি তা বুঝতে লহমাও দেরি হয় না। বাদার জীবনে তাদের ঘড়ির দরকার বা কি? কোন আহাম্মক বাদায় বসে ঘন্টা মিনিট সেকেন্ডের হিসেব কষে আয়ুক্ষয় করবে! সূর্য উঠলে দিনন শুরু, সূর্য ডুবলে শেষ- এইটুকু জানলেই বহুত।

রতনের একটু শহুরে পালিশ আছে ওর মধ্যেই। তোতনের দাদার অফিসে আগে সুন্দরবনের মধু বেচতে আসত মাঝে মাঝে। নোটনের সঙ্গে সেই থেকে চেনা। অফিসে যথেষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি নোটন এই কদিন হল রতনকে সে-ই চাকরি দিয়েছে। রতনের কাছে এখন নোটন মা-বাবা।

যোগাযোগটা কিছু অদ্ভুত। শর্মিষ্ঠাকে তার কলকাতার ফ্ল্যাটে পাওয়া গেলে এতদূর ছুটতে হত না তোতনকে। শর্মিষ্ঠার অ্যাপার্টমেন্টের হাউসে খবর পেল, সে সন্দেশখালি কোরাকাঠিতে বাপের বাড়ি গেছে। কবে ফিরবে ঠিক নেই। কোথায় কোরাকাঠি কোথায় সন্দেশখালি কিছুই জানে না তোতন। শুনে তার দাদা নোটন বলল, দাঁড়া, সুন্দরবনের একটা ছেলে আছে। সেই ঠিক জানে। পরদিনই রতন এসে হাজির, কোরাকাঠি! সেখানে আমাদের দোবেলা যাতায়াত। কাছেই। আতাপুর থেকে মাত্র কয়েক মাইল। আমি নিয়ে যাবোখন।

সে-ই আসা। শর্মিষ্ঠার বাবা পরিতোষবাবু আতাপুর হাইস্কুলের মাস্টারমশাই। শুধু মাস্টারমশাই নন, তাঁর লাট অঞ্চলে বেশ বিষয় সম্পত্তি আছে। সুদে টাকা খাটানোর ব্যবসা আছে। ভ্যানগাড়ি এবং ভটভটিও আছে। বেশ ভাল অবস্থা, বাদার বড়লোক বলতে যা বোঝায়। ধামাখালির দিকে একখানা মাছের ভেরি কেনারও তালে আছেন।

বিষয়ী লোকদের বিশেষ পছন্দ করে না তোতন। শর্মিষ্ঠার বাবা বিষয়ী বলেই কি-? না, থাকগে, এই উদাসী নদী পাড়ি দিতে দিতে ওসব চিন্তা করাও বোধহয় ভাল নয়।

রতন, আমার ব্যাগটা?

কোনও ভয় নেই দাদা, ব্যাগ আমার কাঁধে।

তোতন কোরাকাঠি আসবে বলে রতন শুক্রবার এসে একবার দেশ থেকে ঘুরে গেছে। রাস্তাঘাট ঠিকঠাক আছে কিনা, ভ্যানগাড়ি পাওয়া যাবে কিনা, কোন সময়ে এলে সুবিধে হবে ইত্যাদি। তবে বুদ্ধি করে শর্মিষ্ঠকেও তার আসবার খবরটা যদি দিয়ে আসত তাহলে একটুও টেনশন থাকত না তোতনের। সে যদি কোরাকাঠি গিয়ে শোনে যে, শর্মিষ্ঠা আজই রওনা হয়ে গেছে কলকাতায়?

শহরের ভাত পেটে পড়ায় রতনের তবু একটু পালিশ আছে। বাসু নিতান্তই আকাড়া। আতাপুর থেকে বাসুকে জুটিয়ে নিয়ে গেছে রতনই। যাতে দুজনে মিলে তোতনের দেখভাল করতে পারে। রতনের খুব ইচ্ছে আজকের রাতটা তোতন আতাপুরে তাদের বাড়িতে থাকুক। রতন মুর্গী, গাওয়া ঘি আর কাঁকড়ার লোভ দেখিয়ে রেখেছে। গেলেই হয়।

রতন আর বাসু দুজনেই পরিতোষবাবুকে ভালই চেনে। দুজনেই আতাপুর হাই স্কুলে পড়েছে। তবে হ্যাঁ, পরিতোষবাবুর ছোটো মেয়ে শর্মিষ্ঠাকে তারা ভাল চেনে না। দেখেনি কখনও। তবে তারা শুনেছে বটে, পরিতোষবাবুর ওরকম একটি মেয়ে আছে। দুঃখী মেয়ে। তার বেশী কিছু তারা জানে না। ভাগ্যিস জানে না।

সময় বিশেষ নেই। নইলে কলকাতায় শর্মিষ্ঠার ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেত। তবে এও কিছু খারাপ হল না। সে তো আউটিং চেয়েছিল। এও একরকম আউটিং। খারাপ কি? আজ সে ক্রিটিক্যাল চোখে কিছুই বিচার করছে না। ধামাখালির আরশাদ মিঞার ঘাট থেকে শুরু করে এই যা দেখছে সবই যেন তার পূর্ব পূর্ব নানা জন্মের চেনা জায়গা। শুধু স্মৃতির ফ্লাডগেট খুলছে না। খুললে হাজার জন্মের স্মৃতির তোড়ে ভেসে যেত তোতন। কিন্তু বন্ধ অর্গলে ঘা লাগছে বড়। এক জন্মে কী সুখ? জন্ম জন্মান্তরে ছড়িয়ে না পড়লেই এই স্বল্পের এই ক্ষুদ্রত্ব নিয়ে থাকে কি করে তোতন?

দাদা, এস গেলুম যে। ওই, ওই হাবিলি ঘাট। বড্ড কাদা এখানে, নাববেন না যেন। আমরা কাঁধে করে নামিয়ে নেবো।

লক্ষ্মী ছেলের মতো মাথা নাড়ল তোতন। আর ঘন করে ভটভটি ঠেকল ঘাটের চরায়।

যাত্রীরা জুতো চটি ব্যাগ পোঁটলা নিয়ে টপাটপ কেমন কাদায় নেমে পড়তে লাগল। যেন মোজাইক করা বাঁধানো জায়গা।

এক গাদা লোকের সামনে দুটো চ্যাংড়া ছেলে তাকে দুর্গামূর্তির মতো কাঁধে করে নামাবে এটা যে হতে দেওয়া যায় না তা মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিল তোতন।

এবং বেবুবের মতে কাদায় গেঁথে গেল একেবারে। ভারী এটেল কাদা। বেকাদার জিনিস

বাসু হাঁ করে দেখল দৃশ্যটা, মুখের বাক্য হরে গেছে। রতন হাঁ হাঁ করে ওঠে, এঃ হেঃ, কী করলেন দেখুন তো। আমরা ছিলুম কি করতে? কাদাটুকু পার করে দিতে পারতুম না? দাদা যেন কী! সাহেব মানুষের কি এসব পোষায়?

নিজের প্রকৃত অবস্থাটা বুঝে তোতন পা তুলতে গিয়ে দেখল পা উঠছে বটে, কিন্তু চটি নয়। চটি খুলে সবাই হাতে নিয়েছে, সে নেয়নি। ফলে চটির এখন ডাহা বিসর্জন। এই দেড় হাত কাদার অতল থেকে চটি তুলবে কে?

বাসু রতন দুজনেই দুধারে লাফ দিয়ে নামল।

বাসু জিজ্ঞেস করে, পায়ে চটি ছিল?

ছিল।

পা তুলে ফেলুন, আমি চটি খুঁজে বের করি।

দরকার নেই। এখানে হাওয়াই চটি কিনে নিলেই হবে।

কিন্তু আমাদের বদনাম হয়ে যাবে। আপনি রতনদার সঙ্গে এগোন, আমি ঠিক চটি নিয়ে আসছি।

কাদা ভেঙে, এঁটেল মাটির পিছল অনেকটা আঘাটা পেরিয়ে ওপরে উঠে একখানা চায়ের দোকানের বেঞ্চে তাকে বসাল রতন। দৌড়ে এক মগ জল নিয়ে এল।

করো কি করো কি? বলে বাধা দেওয়ার আগেই রতন পায়ের কাছে বসে চটপট হাতের কানায় পায়ের কাদা চেঁছে জল ছিটকে পা ধুতে লেগে গেল। কে শোনে কার কথা?

তোতন সিঁটিয়ে বসে রইল। জ্ঞানবয়সে কেউ তার পা ধুয়ে দেয়নি আজ অবধি।

এটা কি হল রতন?

পুণ্য হল। আপনি যা কাণ্ড সব করে বসেন।

কাদা-মাখা তোতনের চটিজোড়া হাতে ঝুলিয়ে বিজয়গর্বে হাসিমুখে হাজির হয়ে গেল বাসুও। মাথা নেড়ে বলল, ভাঁটি বলে কথা। কাদায় একেবারে সেঁধিয়ে গিয়েছিল। ধুয়ে এনেছি মদনের দোকান থেকে। এই যে।

তোতন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মায়া জন্যে যাচ্ছে। একটু আগেও এই ছেলে দুটোর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল নিতান্তই আলগা। এখন মায়া ঘনীভূত হচ্ছে। কালো রোগা, অকিঞ্চন সরল এ দুটি পোঁয়ো ছেলে ক্রমশ ঢুকে পড়ছে নাকি তার জীবনে?

সম্পর্ক ব্যাপারটাই অদ্ভুত। তুমি চাও বা না চাও কিছু মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রচিত হয়েই যায়, বাসের সেই সতেরো বছরের ছুঁড়িটাও কি শুধু চোখে চোখে সেতুবন্ধন রচনা করে গেল না! বাস রাস্তা আরও হলে কি হত বলা যায় না।

রতনের ভ্যানগাড়ি আর পাকা রাস্তা দেখে একটু কি দমে গেল তোতন? যেমন এখানকার ভাটভটি তেমনই ভ্যানগাড়ি। দুটোই ইমপ্রোভাইজেশন। রিকশার মতোই জিনিস, তবে পিছনে স্রেফ একখানা কাঠের তক্তা পাতা। আর পাকা রাস্তা হল গেঁয়ো হাঁটাপথটাই দু'নম্বরী ইঁট দিয়ে বাঁধানো। যার যেমন দরকার ইঁট তুলে নিয়ে গেছে রাস্তা থেকে। সরকার যখন জনগণের বাপ, তখন এ রাস্তাকে বাপের রাস্তাও বলা যায়। ফলে জনগণের বাপের রাস্তায় এখন বড় বড় গর্ত। ভ্যানগাড়ি যা লাফাবে তা আগেভাগে আন্দাজ করে শিউরে উঠল তোতন। রতন, হেঁটে গেলেই তো হয়।

হাঁটবেন! বলে এমনভাবে তাকাল রতন যে তোতন বুঝল, হাঁটার প্রশ্নই ওঠে না। এরা তার খিদে তেষ্টা নিয়ে ভাবছে, পথশ্রম নিয়ে ভাবছে। ওদেরই ভাবতে দেওয়া ভাল। শুধু একটু কালো কফি খেতে ইচ্ছে করছে তোতনের। নেশা বলতে ওই একটাই। কিন্তু কালো কফি না জুটলেও অসুবিধা নেই তোতনের। সে কালো কফির কথা ভাবতে থাকবে বসে বসে। আর তাতেই অনেকটা কফির স্বাদ গন্ধ পেয়ে যাবে। আজ অবধি তোতন যা যা পেতে চেয়ে পায়নি তার সবই সে ভাবতে ভাবতে খানিকটা পেয়ে যায়।

ভ্যান চলেছে। প্রকৃতির ফাঁকে ফাঁকে দীনদরিদ্র জনবসতি। এখানে ডাক্তার বদ্যি নেই, বিদ্যুৎ নেই, বাজারহাট তেমন নেই, বাবু জিনিস কিছুই পাওয়া যায় না। হেলথ সেন্টারের ঘরে এরা সযত্নে গোবরের গাদি করে, গরু-ছাগল রাখে। শোনা যায়, একটা হেলথ সেন্টারের ঝাড়ুদারই ওষুধ-টনিক দেয়। ঘরে দোরে সাপ আর বিছের অবাধ আনাগোনা। এইখানে যারা থাকে তাদের ঈশ্বরবিশ্বাস প্রায় বাধ্যতামূলক, কারণ ঈশ্বর ছাড়া আর ভরসা করার কিছুই নেই যে।

ঝকাং ঝক ঝকাং ঝক করে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কেৎরে এবং তেলহীন চাকার কর্কশ শব্দ তুলে ভ্যানগাড়ি চলেছে। সামনে প্যাডেল মারছে একজন, পিছন থেকে ঠেলা দিচ্ছে একজন। এটাই রীতি। ডবল ম্যান পাওয়ার ছাড়া পুশ অ্যাণ্ড পুল ছাড়া এ রাস্তায় নোনা বাতাসে মরচে ধরা ভ্যানগাড়ি চলতে চায় না।

পেটে খিদে চারদিকে নেশাগ্রস্ত ঝিমঝিমে দুপুরম ভ্যানগাড়ির উৎকট শব্দ সব মিলিয়ে মাথাটা কেমন বোঁদা হয়ে গেল তোতনের। বসে বসেই সে ঢুলতে লাগল। তার মধ্যেই স্বপ্ন দেখতে লাগল। তার মধ্যেই মাঝে মাঝে চোখ খুলে চারদিককার প্রকৃতিরও দেখতে পেল। এবং কিছুক্ষণ পরে সব কিছু একাকার হয়ে যেতে লাগল।

এই কি তোমার সুন্দরবন রতন? সন্দেশখালিতে একসময় জঙ্গল ছিল না?

রতন কাঁচমাচচু মুখ করে বলে, জঙ্গল ছিল বাঘ ছিল। এখান সব বসত হয়ে গেছে। বাঘের জঙ্গল মেলা দূরে। এখানে শেয়াল অবধি দেখা যায় না এখন। নামেই সুন্দরবন। কিছু নেই।

শুনতে শুনতে আবার একঝলক স্বপ্নের মধ্যে চলে গেল তোতন। আবার বাস্তবে ফিরল যখন রতন তাকে ডেকে একটা হেলথ সেন্টার দেখিয়ে বলল, ডাক্তারবাবু থাকেন বসিরহাট কস্মিনকালেও আসেন না। ওষুধপত্র দূরের কথা, জানালা দরজা অবধি খুলে নিয়ে গেছে।

তোতন দেখল। এরকমই শুনেছে সে। এরকমই হওয়ার কথা। চোখ বন্ধ করতেই ফের আধখানা ঘুমের রাজ্যে চলে গেল তোতন। অস্ফুট স্বরে বলল, এই তো ভাল। সভ্যতা লোপট করে ফের দুনিয়া জঙ্গলে ভরে দাও। আত্মঘাতী মানুষের কান মলে দাও কষে। কল-কারখানায় দুনিয়াটাকে কিরকম হিজবিজবিহ করে ফেলেছে দেখছো না।

কথাগুলো রতনের কানে গেল না অবশ্য। সে আর একটা দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছিল, ওই যে দেখছেন ও সব বাঙালদের বাড়ি ঘর। ওদের হাতে গাছ খুব হয়।

অসুখ হলে তোমরা কি করো রতন।

গাঁয়ে হাতড়ে আছে তবে আমরা যাই হোমিওপ্যাথের কাছে। আর ভরসা হলেন ভগবান।

তোতন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার চারদিকটা গুলিয়ে গিয়ে স্বপ্ন আর বাস্তব মেশামেশি হয়ে যেতে লাগল।

ভ্যানগাড়িটা একটা বীভৎস ঠক্কর সামলে ডানদিকে কাত হয়ে ফের সোজা হল। বুকটা দুটো কারণেই ধক করে উঠল তোতনের। ভ্যানের ঝাঁকুনি আর শর্মিষ্ঠা। ঘুমের চটকা উবে গেল। টান টান হয়ে বসে সে মায়াভরে দেখল, সামনে কিশোর ছেলেটি ভ্যানগাড়ি চালাতে চালাতে ঘামে হাপুস হয়ে ভিজে গেছে। নোনায় মরচেপড়া গাড়ি চালাতে গিয়ে দড়ির মতো ফুলে পাকিয়ে উঠছে ওর পিঠের পেশী। পিছনে আর একজন জানকবুল হয়ে গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে ঘামে আর ধুলোয় হয়রান।

তোতন মনে মনে প্রস্তুত হওয়ার চেষ্টা করল। পারল না। কোনও প্রস্তুতিই কাজে লাগবে না।

নিউ ইয়র্ক থেকে রওন হওয়ার তিন দিন আগে পরাগের কুইন্সের বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোতনের। একসময়ে পরাগ তার খুব বন্ধু ছিল। এখন নেই। এখন পরাগের মধ্যে অনেক ভাঙচুর, অনেক জটিলতা, চেহারায় যেন বুড়িয়ে যাওয়ার ছাপ। শর্মিষ্ঠার চৌদ্দ ভরি সোনার গয়না আর কলকাতার ব্যাংকে তার অ্যাকাউন্টে আড়াই লাখ টাকার একটা চেক তাকে দিয়ে পরাগ বলেছিল, শর্মিষ্ঠাকে বলিস আর যেন অ্যালিমনিটনি দাবি না করে। কলকাতার ফ্ল্যাটটাও ওরই দখলে চলে গেল। আর কী চায় ও?

একজন পাজি স্বামীর কাছ থেকে যেটুকু আদায় হয়েছে কিনা সেটা শর্মিষ্ঠা বিচার করবে। কিন্তু তোতনের বিচারে, আমেরিকার স্ট্যান্ডার্ডে না হলেও-ভারতীয় অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে শর্মিষ্ঠা ঠকছে না। তবে মার্কিন আদালতে ডিভোর্সের মামলা করলে শর্মিষ্ঠা আরও অনেক বেশী আদায় করতে পারত। হয়তো পরাগকে আরও দশে মারার জন্যই ডিভোর্স দেয়নি শর্মিষ্ঠা। গয়নাগুলোর জন্য সাঙঘাতিক টেনশন ছিল শর্মিষ্ঠার। প্রতি চিঠিতে গয়নার কথা থাকত। কিছু নিয়ে আসতে পেরেছিল, বাকি চৌদ্দ ভরির আটকে রেখেছিল ওরা, অর্থাৎ পরাগ এবং তার মা। পরাগের মা-অর্থাৎ মাতুমাসী মাস দুই আগে মারা যান। যতদিন মাতুমাসী বেঁচে ছিলেন ততদিন আর ও বাড়িতে যাওয়ার পথ ছিল না তোতনের। আর ততদিন কিছু আদায়ও করা যায়নি। মাতুমাসী ছিলেন যাকে ওদেশে বলে টাফ উওম্যান। রিয়েল টাফ। পরাগের হাতে বেধড়ক মার খেয়ে যেদিন শর্মিষ্ঠা ও বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে এল নিউ জার্সিতে তোতনের বাড়িতে সেদিন থেকে তোতকে বয়কট করেছিলেন মাতুমাসী। যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মুখদর্শন করেননি।

কিন্তু তোতনের কীই বা করার ছিল? কতগুলো ঘটনা আছে যার লাগাম মানুষের নিজের হাতে থাকে না। শর্মিষ্ঠার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়াটার কথাই ধরা যাক। যেদিন তার নিউ ইয়র্কে পৌঁছোনোর কথা সেদিনও পরাগের সাঙঘাতিক জরুরী কাজে সান ফ্রানসিসকো চলে যেতে হয়েছিল। তার বউ প্রথম বিদেশে আসছে, রিসিভ তারই করা উচিত। পরাগ তিন দিন আগে এসে তোতনকে ধরল, আমার বউকে রিসিভ করতে তোকে যেতে হবে।

তোতন খুব রেগে গেল, কেন যেতে পারবি না? যদি অফিস তোকে ট্যুর থেকে না ছাড়ে তবে তুই চাকরি ছাড়। এদেশে তো চাকরির অভাব নেই।

পরাগ অনেক ধানাই পানাই গাইল। কাজটা জরুরী ঠিকই। কিন্তু বউয়ের ব্যাপারে কিছু থাকলে মার্কিন সাহেবেরা নরমও হয়। পরাগ তেমনভাবে অফিসে দরবার করলে ছুটিও হয়তো পেয়ে যেত। কিন্তু চাকরিতে উন্নতি করার অদম্য নেশা পরাগের। চাকরি করে প্রাণ দিয়ে। অল্প সময়ে যথেষ্ট উঁচুতে উঠে গেছে। আরও উঁচুতে উঠতে চায়। চাকরির ব্যাপারে কোনও আপসরফাই সে কখনও করে না।

তোতন জুলাইয়ের এক গরম অপরাহ্নে তার দুখানা গাড়ির শ্রেষ্ঠটি অর্থাৎ বি এম ডবলিউ নিয়ে যথারীতি হাজির ছিল এয়ারপোর্টে। শর্মিষ্ঠার চেহারা তাকে ফটোগ্রাফ দেখিয়ে চিনিয়ে রেখেছিল

পরাগ। তাছাড়া একগাদা বাঙালী মেয়ে তো আর নামবে না প্লেন থেকে। বিরক্তি আর ধৈর্যহীনতা নিয়ে ইমিগ্রেশনের বাইরে অপেক্ষা করছিল সে। একটু নার্ভাস মুখে, হতক্লান্ত যুবতীটিকে যখন দেখা গেল, ট্রলি ঠেলে নিয়ে আসছে এবং চোখে আতঙ্ক মেশানো দৃষ্টি, তখনই একটা কিছু ঘটে গিয়েছিল তোতনের ভিতরে। এ হচ্ছে সেই সব ঘটনার অন্যতম যার লাগাম মানুষের হাত থাকে না। ট্রলিটা ওর হাত থেকে নীরবে কেড়ে নেওয়ার পর তোতন জিজ্ঞেস করল, আপনিই শর্মিষ্ঠা তো!

আর আপনি তোতন! কী অদ্ভুত নাম। আপনার কোনও ভাল নাম নেই? শর্মিষ্ঠার হাসি দেখে, চোখ দেখে, গলা শুনে তোতনের অভ্যন্তর তার বিবেক গলা খাঁকারি দিয়েছিল। বাপু হে, সাবধান?

কিন্তু বিবেকের কথায় কেই বা কবে কান দিয়েছে? বিবেক তার মনে বলে যায়, আর মানুষ তার মতলবমতো চলে। তোতন বলল, না। আমার এই একটাই নাম। অপছন্দ হলেও কিছু করার নেই।

অপছন্দ মোটেই নয়। একটু অদ্ভুত, এই যা. আচ্ছা. নিউ ইয়র্কের ভিতর দিয়েই তো আমরা যাব। দেখা যাবে না শহরটা?

একটু বাদেই দেখতে পাবেন বাঁ ধারে। তবে আমারা শহরটাকে বাইপাস করে বেরিয়ে যাবো।

ইস, একটু ভিতর দিয়ে গেলে হত না! নিউ ইয়র্ক দেখব বলে কতদিন ধরে অপেক্ষা করছি।

তোতন একটু হেসে বলে, নিউ ইয়র্ক দেখবেন তাতে আর অসুবিধে কি?

দেখতে দেখতে চোখ পচে যাবে।

তবু প্রথম দেখা বলে একটা কথা আছে না!

হ্যাঁ, তা আছে। তবে কি জানেন, নিউইয়র্ক একটু দূরে থেকে দেখতেও খুব ভাল। এবার আপনি বাঁ দিকে তাকান, ওই নিউ ইয়র্ক। আজ আপনার কপাল খারাপ, একটু মিষ্ট আছে। আবছা দেখাচ্ছে।

কিছুক্ষণ বাঁ দিকে চেয়ে শর্মিষ্ঠা নিউ ইয়ার্ক দেখল। রোদ থাকা সত্ত্বেও আটলান্টিকের রহস্যময় কুয়াশা মাঝে মাঝে এরকম ভাবে ঝুলে থাকে শহরের ওপর।তবু নিউ ইয়ার্কের অসাধারণ আকাশরেখা পেনসিলে আঁকা ছবির মতো দেখা যাচ্ছিল ঠিকই।

শর্মিষ্ঠা কিছুক্ষণ পর হঠাৎ নীরবতা ভাঙল, আচ্ছা আপনি বোধহয় পরাগের খুব ইন্টিমেট বন্ধু। আপনার কথা খুব লেখে টেলিফোনেও বলেছে।

তাই নাকি? এইবার আমরা ব্রুকলিন ব্রীজ পেরোবো। সামনে ওই যে দেখা যাচ্ছে।

বাঃ, বিরাট ব্রীজ, না? আপনি তো ব্যাচেলর। শুনেছি একা একটা বিরাট বাড়ি নিয়ে থাকেন।

তোতন ফের এই ছেলেমানুষী প্রশ্নে হাসল, বাড়িটা আমি কিনেছি। কোনও চয়েস ছিল না তো, কপালে একটা বড় বাড়িই জুটে গেল।

বিয়ে করেন না কেন? অত বড় বাড়িতে একা থাকে নাকি লোকে?

বিয়ে! সে দেখা যাবে।

আপনি একটু কিপটে আছেন, না? কিপটেরা চট করে বিয়ে করতে চায়না। আগে টাকা জমায়, ঘর গোছায়, তারপর পাকাচুল নিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে। আচ্ছা আপনার আবার মেমসাহেবের দিকে ঝোঁক নেই তো!

প্রথম আলাপেই কোনও বাঙালী মেয়ে যে এরকম প্রগলভ হয়ে উঠতে পারে তার কোনও ধারনা ছিল না তোতনের। আর এত ফ্রি।

বিবেক আর একবার গলাখাঁকারি দিল, এ মেয়ে কিন্তু ভিগাবে হে। তফাত থেকো।

শর্মিষ্ঠাকে অভ্যর্থনা করলেন মাতু মাসী। বিরস মুখ। কলিং বেল বাজাবার পর এমন ভাবে দরজা খুলে ধরলেন যেন ভিতরে যেতে দেওয়ার তেমন ইচ্ছে নেই।

শর্মিষ্ঠার দুখানা ঢাউস স্যুটকেস গাড়ির থেকে নামিয়ে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার পরও মাতুমাসী সেদিন কফিটুকুও অফার করলেন না। শর্মিষ্ঠা ঘরে পা দেওয়ার পরই কেমন থমথমে হয়ে উঠল আবহাওয়া।

তখনই বুঝে গিয়েছিল তোতন মেয়েটার কপালে কষ্ট আছে। পরাগকে সে জানে। এক নম্বরের দায়িত্বহীন। মাতুমাসী অতিশয় খর স্বভাবের মহিলা। কী হবে না হবে কে জানে বাবা।

দেশ থেকে নতুন বউ এল একটু পার্টি-টার্টি দেওয়ার প্রথা আছে বাঙালীদের মধ্যে।পরাগ সে সবের ধার দিয়েও গেল না। শুধু টুর থেকে ফিরে একদিন টেলিফোন করে বলল, আমার বউকে কষ্ট করে রিসিভ করেছিস বলে ধন্যবাদ। ও তোর কথা খুব বলেছে।

তাই নাকি? কিন্তু বলবার আছেটা কী,পরিচয়ই তো হয়নি ভাল করে।

তবু বলেছে। সবই বেশ প্রশংসাসূচক।

ভেবেচিন্তে দাবাড়ুর মতো একটা চাল দিল তোতন,মাস্তুমাসীর তো এবার সুবিধেই হল, একটু বেশ বিশ্রাম পাবেন। ঘরকন্না করার লোক এসে গেছে।

টেলিফোনে একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল পরাগের, মাকে তো জানিস। শর্মিকে হেঁসেলে এখনও ঢুকতে দেয়নি। একদিন কী একটা রান্না করেছিল, সেটা ভাল হয়নি। ব্যস,মা বিগড়ে গেল। এনিওয়ে, চলছে।

তোতন আর ঘাঁটায়নি। তোতন সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করল, তোর বউ কি এখন বাড়িতে নেই?

থাকবে না কেন? আছে।

দে টেলিফোনে। কথা বলি।

নো লাক। বাইরের ঘরে কয়েকজন এসেছে। বিজি টকিং। পরে ফোন করবেখন। তুই একদিন চলে আয় না,এই উইক এন্ডেই আয়।

আমন্ত্রণটা খুব আন্তরিক ছিল না। তবু সে রাজি হল। তোতনের শহর থেকে পরাগের শহরের দূরত্ব ত্রিশ মাইলের বিশী নয়। এ দেশের মাপে দূরত্ব খুবই কম। উইক এন্ডে তোতন খুব আলসেমি করে। দুটো দিন দাড়ি কামায় না, বই পড়ে, ভিডিও দেখে, কেউ এলে আড্ডা মারে এবং চিঠি পত্র লেখে। আজকাল সে আর বেশী বেড়াতে-টেড়াতে যায় না। সেই উইক এন্ডে দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে, পোশাক করে গেল পরাগের বাড়ি।

মাস্তমাসী নিজে ভালই গাড়ি চালাতে জানেন এবং উইক এন্ডে তিনি নিয়মিত মঠ মন্দিরে যান। কখনও রামকৃষ্ণ মিশনে,কখনও ইসকনের বাঙজরাতিদের মন্দিরে। চেনাজানাদের বাড়িতে গিয়েও থেকে আসেন কখনও খখনও। সেদিন গিয়ে তাজ্জব হয়ে তোতন দেখল, মাস্তুমাসী তার সাপ্তাহান্তিক আউটিং-এ গেছেন বটে, কিন্তু সারথি হিসেবে ছেলেকেও নিয়ে গেছেন। ওঁর নাকি প্রেশার বেড়েছে,গাড়ি চালাতে পারবেন না।

শর্মিষ্ঠা বাইরের ঘরে বসেই কাঁদছিল। যখন দরজা খুলল তখন তার মুখে কান্না ছলছল করছে।

তোতন সাংসারিক জীব নয়, মহিলাদের ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা কম এবং ভয় বেশী। সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, ক্-কী ব্যাপার? যখন দেখল শর্মিষ্ঠা ছাড়া আর কেউ নেই তখন সে আরও তোতলাতে লাগল।

থম্ ধরা মুখে শর্মিষ্ঠা তাকে বাইরের ঘরে এনে বলল, বসুন।

ওরা আপনাকে একা রেখে চলে গেল কেন?

সেটা তো আমারও প্রশ্ন। কিন্তু জবাবটা কে দেবে?

তোতন অত্যন্ত বিস্মিতভাবে মাথা নেড়ে বলে, অথচ আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল পরাগ। এর কোনও মানে হয়?

আপনাকে আপ্যায়ন করার ভার আমার শাশুড়ি আমাকেই দিয়ে গেছেন। ওঁরা রাতে ফিরবেন। অনেক প্রোগ্রাম। আপনার ভয় নেই, রান্না উনি নিজেই করে রেখে গেছেন

তোতন ফের তোতলাতে লাগল,ন-না-মানে-এভাবে একা বাড়িতে-ঠিক-এ কি হয়?

আপনি ভীষন ঘাবড়ে যাচ্ছেন। মাথা ঠান্ডা করে বসুন। আপনাকে আমার কয়েকটা প্রশ্ন করার আছে। তোতন কিন্তু ক্রমেই আরো ঘাবড়াচ্ছিল। অথচ একজন মহিলার সঙ্গে একা বাড়িতে কয়েক ঘন্টা কাটানোর মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। আমেরিকায় কত বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে সে আড্ডা মেরেছে।এদেশে শুচিবায়ুহীন নারী-পুরুষ সম্পর্কের হাওয়ায় তার কেটেছে অনেকদিন। তবে শর্মিষ্ঠাকে দেখে সে ঘাবড়াচ্ছে কেন?

জবাবটা দিল তার বিবেক ওরে আহাম্মক, তোর যে বারোটা বেজেছে। এখনও লেজ তুলে পালা বলছি।

তোতন অবশ্য পালায়নি। মাথা ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করতে করতে সে বলল,কিসের প্রশ্ন?

আপনারা এই জঘন্য দেশে বছরের পর বছর আছেন কি করে?

শর্মিষ্ঠার গলার স্বাঁঝ আর তিক্ততায় থতমত খেয়ে তোতন বলল,জঘন্য! আপনি ভাল করে দেখেননি এখনও, তাই--

সমান ঝাঁঝের সঙ্গে শর্মিষ্ঠা বলে, অনেক দেখেছি। কী আছে এদেশে? শুধু গোলকধাঁধার মতো রাস্তা, বড় বড় বাড়ি আর বনজঙ্গল। দেখতে সুন্দর হলেই হল!

তোতন নরম গলায় বলে, আর কিছুদিন থাকুন, ভাল লাগবে। প্রথম প্রথম কেমন যেন লাগে বটে।

মোটেই নয়। আমার কোনওদিনই আমেরিকা ভাল লাগবে না। আমার আর একটা প্রশ্ন,আপনার এত চাকরি-চাকরি করে পাগল কেন? সারাদিন চাকরি করা ছাড়া আপনাদের আর লাইফ বলে কিছু নেই?

এদেশে তো কাজে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই কিনা।

তা বলে এরকম ক্রীতদাসের জীবন! চাকরির ভয়ে একজন পুরুষমানুষ এত সিটিয়ে থাকবে!

তোতন এবার খুব মৃদু স্বরে বলল, পরাণের ব্যাপারটা একটু আলাদা। ও বড় চাকরি করে, টেনশন বেশী। ওসব কথা একটু থাক না। বরং এক কাপ কালো কফি খাওয়ান চিনি ছাড়া।

শর্মিষ্ঠা কেন যেমন একথায় এক ঝলক হাসল। কী যে সাঙঘাতিক এবং বিপজ্জনক হাসি তা টের পেয়ে, মাঝদরিয়ায় তুফানে-পড়া নৌকোর মাঝির মতো বিবেক চেঁচিয়ে উঠল, সামাল! সামাল! চোখ বুজে ফেল! বাস্তবিকই চোখ বুজে ফেলেছিল তোতন।

মোলায়েম গলায় শর্মিষ্ঠা বলে, আপনি কি খুব টায়ার্ড? চোখ বুজে আছেন যে! আপনি কেমন আছেন শর্মিষ্ঠা?

আমি ! ও মা, কেন? আমি তো খুব ভাল আছি, রাজেন্দ্রানীর মতো আছি। দেখছেন না রাজ্যপাট আমার হাতে দিয়ে ওরা মায়ে পোয়ে কেমন চলে গেছেন!

তোতন মাথা নেড়ে বলে বুঝতে পারছি আগে কফিটা খাওয়ান, তারপর চলুন আপনাকে একটু ঘুরিয়ে আনি।

কোথায়?

নিউ ইয়র্ক।

শর্মিষ্ঠার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তোতনের তোতলামি সবটাই সেরে গেল তার বি এম ডবলুতে চড়ে নিউ ইয়র্ক শহর শর্মিষ্ঠাকে দেখতে দেখতে।

শর্মিষ্ঠা মুগ্ধ, আবিষ্ট। ভেলিকাটেসেনের সুস্বাদু খাবার, রাস্তার আইসকিক্রিম, এ সবই সম্মোহিত করে দিল মেয়েটাকে।

কী, এখন আমেরিকা কেমন লাগছে? ততটা জঘন্য কি?

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে শর্মিষ্ঠা সামান্য ধরা গলায় বলল, আপনার সঙ্গে তো ভীষণ ভাল লাগছে। কিন্তু গত দুটো উইক এণ্ড- এ ও আমাকে নিয়ে বেরিয়েছিল। কী যে বিশ্রী লেগেছে!

বিবেক বলে উঠল, লক্ষণ ভাল নয়, ভাল নয়, ভাল নয়.....

এ ঘটনার দু'সপ্তাহ বাদে এক শনিবার সকালে তোতন একটা নেমন্তন্নে বেরোচ্ছিল, সেইসময়ে শর্মিষ্ঠার ফোন এল, এই আপনার হাতে আজ সময় আছে?

কেন বলুন তো!

আজ একটু বেড়াতে যাবেন কোথাও?

আজ যে আমার একটা নেমন্তন্ন আছে ব্রিজ খেলার। সেখানেই খাওয়া-দাওয়া, নাইট স্টে।

আহা, ব্রিজ খেলা আবার একটা ব্যাপার নাকি? ঘরে বসে বসে সময় কাটানোর চেয়ে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দ কত বেশী বলুন!

কেন, পরাগটা আপনাকে নিয়ে বেরোয়নি বুঝি আজ?

পরাগ! সে পাখি তো পরশু দিন উড়ে গেছে।

কোথায়?

সান ফ্রানসিসকো। মিড উইকে ফিরবার কথা।

আর মামুমাসী?

তাঁর ব্লাডপ্রেশার কমে গেছে। সকালে ব্রেক ফাস্টের পরই বেরিয়ে গেছেন। রাতে ফিরবেন।

আচ্ছা, আপনি গাড়ি চালানো শিখছেন না কেন?

কে শেখাবে বলুন।

শেখানোর লোক আছে। ওটা না শিখলে এখানে ঘরবন্দী হয়েই থাকতে হবে আপনাকে। শহরটাও চিনে নেওয়া দরকার। এ দেশে সব জায়গার রোড ম্যাপ পাওয়া যায়। সেগুলো দেখে দেখে......

আচ্ছা, এত উপদেশ দিতে হবে না। পারবেন কিনা বলুন।

তোতন বিপন্ন গলায় বলে, কি হয়েছে জানেন ওরা সবাই অপেক্ষায় করবে তো–

ব্রিজ খেলা মোটেই ভাল নয়। আমি কিন্তু আপনার আশায় প্রায় সেজেগুজে বসে আছি। না এলে সারাটা দিন একা কি করে কাটাবো বলুন তো! একা বেরোতে ভীষণ ভয় করে, যদি রাস্তা চিনে ফিরে আসতে না পারি!

এ যেন এক বিপন্ন নারী সমর্থ পুরুষের সাহায্য চাইছে করুণ আর্ত কণ্ঠে। আর তোতনের অভ্যন্তরের আদিম পুরুষটি যেন সব বাধা ছিন্ন করে ছুটে যেতে চাইছে সেই বিপন্নার কাছে। বাধা দেওয়ার একটা অক্ষম চেষ্টা করেছিল বটে বিবেক। একটা গণ্ডি টেনে দিয়ে যেন বলে উঠেছিল, খবরদার, এর বাইরে যাসনে।

তোতন বলল, ঠিক আছে। আসছি।

গিয়ে দেখল, দুরন্ত সালোয়ার কামিজ পরা শর্মিষ্ঠা কাঁধে ব্যাগ নিয়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। দেখে যে হাসিটা হাসল তাতে তোতনের হার্টবিট একটা দুটো মিস হয়ে গেল। তারপর লহরা বজতে লাগল বুকের মধ্যে।

অশান্তিটা হতে শুরু করল প্রায় বছর খানেকের মাথায়। ততদিনে শর্মিষ্ঠা গাড়ি চালানো শিখে নিয়েছে। রাস্তা চিনেছে। পরিচিতি বেড়েছে।

শর্মিষ্ঠার এইসব কৃতিত্বে পরাগ খুশিই হয়েছিল, মামুমাসী হননি, শাশুড়ি-বউয়ে যে তুমুল খটাখটি হচ্ছে এটা শর্মিষ্ঠা মাঝে মাঝে ফোনে তাকে জানাত।

সেবার দুর্গাপূজোর উইক এন্ডে সবাই জড়ো হয়েছে কালুদার বাড়িতে। দু' দিতন খাওয়া-দাওয়া আমোদ-ফূর্তির বন্যা। রাতটুকু শুধু হোটেলে বা মোটেলের ঘরে কাটিয়ে সকাল থেকেই পূজোর আসরে সবাই হাজির। সেই সময়ে আচমকাই মামুমাসী তোতনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন বেশ স্পষ্ট দ্বেধাহীন ভাষায়, তোতন, বউমাকে তুমিই কিন্তু নষ্ট করছো।

কি করলাম মাসীমা?

বউমা যখন প্রথম এসেছিল তখন একরকম ছিল, কিন্তু তোমার আসকারা পেয়ে এখন পাখা মেলেছে, তুমি কি আমাদের ঘরের শান্তি নষ্ট করে দিতে চাও?

অবাক তোতন শুধু বলতে পারল, না মাসীমা কিন্তু আমি তো–

এমনিতেই সে কথার ওস্তাদ নয়, বিপদে পড়লে বা ঝগড়ার আভাস পেলে তার কথা আরও হারিয়ে যায়। মামুমাসী আরও দৃঢ় গলায় বললেন, মেয়েমানুষের সবচেয়ে বড় গুণ তার পবিত্রতা, সেটা তো মানো? ওকে নষ্ট করছো কেন?

তোতন 'পবিত্রতা' মানে, কিন্তু অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরতা মানে না। শর্মিষ্ঠার ওপর যে একধরনের মানসিক অত্যাচার চলছে তা সে ভালই জানে। কিন্তু সেকথা সে বলতে পারল না। শুধু চেয়ে রইল।

তুমি ওর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখো এটা আমরা চাই না, পরাগ তোমার বন্ধু, তোমার উচিত ওর মনের দিকে চেয়ে কাজ করা, ওর যাতে ভাল হয় সেদিকে লক্ষ রাখা। যদি ওদের ভালই চাও তো নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে রেখো।

সেবার পুজোর আনন্দটা এমন মাটি হয়ে গেদল তোতনের কাছে যে, সে পুরো সময়টা থাকল না পর্যন্ত। সেদিনই কাউকে কিছু না বলে ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়ে ফিরে এল নিজের একা বাড়িতে।

বেশ অনেকদিন আর শর্মিষ্ঠার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না।

টেলিফোনও আসত না হয়তো শাসন শুধু তোতনকেই নয়, শর্মিষ্ঠাকেও করা হয়েছিল।

নিউ ইয়র্কের ব্রংকসে একদিন সুব্রতর সঙ্গে দেখা। সস্ত্রীক বেড়াতে বেরিয়েছে। কথায় কথায় সুব্রত বলল, শুনেছো, আমাদের পরাগের সঙ্গে নাকি তার বউয়ের খুব খিটিমিটি চলছে।

সুব্রতর বউ প্রগতি নারী স্বাধীনতার একজন উচ্চকণ্ঠ সমর্থক। সে বলল, খিটিমিটি বললে কিছুই বলা হল না, যেন দুইপক্ষেরই দোষ। শুনুন ব্যাচেলরমশাই, পরাগ তার বউকে রোজ অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে পেটাচ্ছে। যাকে খুশি রাখতেই নাকি এই চমৎকার ব্যবস্থা। আপনারা যদি প্রাইভেটলি ব্যাপারটা না মিটিয়ে নেন তাহলে আমরা কিন্তু পুলিশে রিপোর্ট করব।

সেই রাতে পরাগকে টেলিফোন করেছিল তোতন।

পরাগ প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, লিভ আস অ্যালোন, তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

তোতন মৃদু স্বরে বলল, শোন, তোদের অশান্তিতে আমার কোনও ইন্ধন নেই কিন্তু। যদি বলিস তবে আমি মধ্যস্থতা করতে পারি। জেদ করিস না। ব্যাপারটা কিন্তু চাউড় হয়ে যাচ্ছে।

যাচ্ছে যাক। তোর মধ্যস্থতার দরকার নেই।

তুই হাঁফাচ্ছিস কেন? কী হয়েছে?

আমি জগিং করিলাম।

এই শীতের রাতে জগিং! তোর মাথা কি খারাপ হল?

আই ওয়াজ টেকিং সর্ট অফ একসারসাইজ।

সে যাই হোক, আমার প্রস্তাবটা একটু ভেবে দেখিস।

অশান্তির মূলে তো তুই-ই। তোর মধ্যস্থতা মানব কেন আমরা। আমি! আমি তো কিছু করিনি।

ন্যাকামি করিস না তোতন। শর্মিষ্ঠাকে তুই নষ্ট করেছিস। এই বলে ফোন রেখে দিল পরাগ। অনেকক্ষণ অবধি ওর হাঁফানোর কারনটা কি হতে পারে সেটাইভাবল তোতন। তিনটে মানুষ কেন পরস্পর এক ছাদের তলায় মিলেমিশে থাকতে পারছে না সেটা তার মাথায় ঢুকছে না কিছুতেই। আর পরাগ হা-ফাচ্ছিল কেন? রাত সাড়ে আটটায় স্বাভাবিক নিয়মে কারও হাফানোর কথা না।

পরাগ চাকরিতে আরও উন্নতি করে ফেলল। মাইনে বেড়ে গেল অনেক। বাড়ল্ল কাজ এবং ঘোরাঘুরি। প্রায়ই আফ্রিকা এবং ইউরোপ যেতে হচ্ছে তাকে। ঘরে একটি সাপ ও একটি নেউল কি ভাবে দিন কাটায় কে জানে! তোতন ভয়ে আর খোঁজ নেয় না।

একদিন সাফার্নে জয়দেবের বাড়িতে সাপ্তাহিক ব্রিজের আড্ডার কে যেন ... বীয়ারের ফেনা নিয়ে বলে উঠল, ওদের ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে।

কাদের?

পরাগ আর শর্মিষ্ঠার। পাকা খবর নয়, শোনা যাচ্ছে।

কে যেন বড়া চিবোতে চিবোতে বলল, স্যাড। কিছু করা যায় না? ডিভোর্স হয়ে যাওয়াই ভাল। সে আর ভাবছ... ট্রায়িং টু কিল ইচ আদার পরাগের-মা-- থাক গে, গুরুজন বলে কথা।

... মহিলা বলে উঠল, আপনারা কোনও কাজের নন বলেই এরকম হচ্ছে।

... বলার, কর নিন না!

এখন আর লাভ নেই।

জয়দেব সহ প্রত্যেকেই এই সময়ে বার বার কেন যে তোতনের দিকে তাকাচ্ছিল। তোতনের তখন শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা। কারণ সে জানে, পরাগ আর শর্মিষ্ঠার অশান্তিতে তার যে ভূমিকা আছে এটা মাতুমাসী একটু প্রচারই করে থাকবেন।

তাসের আসর থেকে উঠে আসা বেহদ্দ খারাপ দেখায় বলে তোতন ছিল।

যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ কাঁটা হয়ে ছিল ভয়ে।

এর কিছুদিন বাদে এক প্রায়- মধ্যরাতে কলিং বেল-এর আওয়াজে বিস্মিত ও ভীত তোতন দরজা খুলে দেখল, শর্মিষ্ঠা।

আজ দরজা খুলল শর্মিষ্ঠা।

কিন্তু সেই শর্মিষ্ঠাই কি ? সময়ের জল কি পলিমাটির কিছু আস্তরণ ফেলে যায়নি ! এটা তো সেই নিউ জার্সির বসন্তের রাত নয়।

তবু শর্মিষ্ঠাই। চোখ বিস্ময়ে কিছু বিস্ফারিত। মুখ সামান্য একটু ফাঁক হয়ে আছে। তোতনের বুকে লহরটা আর বাজল না বটে, কিন্তু ঢিবঢিবিয়ে উঠল। আজও ! আর আপনি ! কবে এলেন ! খবর দেননি তো!

তোতন এই তপ্ত দুপুরে পেটে খিদে নিয়ে কতটা প্রত্যাশামতো মিষ্টি করে হাসতে পারল তা জানবার উপায় নেই তার নিজের। মানুষ তো নিজের মুখ দেখতে পায় না।

খবর দেওয়া যায়নি, আসবার তারিখ ঠিক ছিল না বলে। প্লেনে সীট পাওয়া যাচ্ছিল না। খুব ভীড়।

আসুন !

ঢুকবার আগে তোতন কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে বাড়িটা একটু দেখে নিল। সুন্দরবন এলাকার পটভূমিতে বাড়িটা কিন্তু খারাপ নয়। পাকা বাড়ি। তবে শ্রী-ছাঁদ বা স্থাপত্য কিছু নেই। সামনে বেশ চওড়া বারান্দা আছে। তার পর ঘর, উঠোন তো থাকবেই, রান্নাঘর, গোয়াল, ধানের গোলা ইত্যাদি।

বাইরে ধঘর বলেও কিছু নেই। যে ঘরে তাকে বসাল শর্মিষ্ঠা তাও একখানা শোওয়ার ঘরই। তবে কাঠের চেয়ার আছে গোটা দুই, আর জলচৌকি। তোতন চেয়ারে আর রতন মোড়ায়। বাপু ঘরে ঢোকেনি। বোধহয় ঢুকবেও না। ঘরে ছায়া আছে বটে, কিন্তু বাতাস নেই। জানালা দরজা ইত্যাদি বেশ ছোটো বলে গুমোটও খুব।

শর্মিষ্ঠা তাদের বসতে দিয়েই ব্রস্ত পায়ে ভিতরে গেছে বোধহয় আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে। এ তার বাপের বাড়ি। মর্যাদাই আলাদা। শর্মিষ্ঠাদের আরও একটা বাড়ি আছে বটে বেহালায়। যতদূর শুনেছে, সেখানে ওর এক দাদা থাকে। পরিতোষবাবু এ জায়গায় বেশ ফাঁদালো হয়ে বসেছেন। জমিজমা চাষাবাস তো আছেই, উপরি হিসাব চাকরিটাও রয়েছে।

রতন চাপ স্বরে বলল, টাকার কুমির। এ যা দেখছেন কিছুই নয়। পরিতোষবাবুর আসল কারবার হল সুদের। কতবার ডাকাত পড়েছে। কিন্তু এইসান চালাক লোক যে ডাকাতরা আসল তহবিলে হাতই দিতে পারেনি।। বসন-কোসন হাঁড়িকুঁড়ি আর দু-চারশো টাকা নিয়ে গেছে। এ অঞ্চলে অবশ্য দ'পাঁচশোর জন্যও ডাকাতি হয়। গরিব দেশ।

তোতন শুনেছিল বটে, তবে মন দিয়ে নয়। পিছনে লম্বা স্মৃতি। কত কী মনে পড়েছে সবচেয়ে বেশী যেটা মনে পড়ছে সেটা হল, গত দুতিন বছরে পরাগের পতন এবং দুরবস্থা। বছরখানেক ধরে একটা নার্ভের অসুখে ভুগছে পরাগ। তার জন্য বড় দায়িত্বের চাকরিটা ছাড়তে হয়েছে। কুইন্সের বাড়ি বেচে দিয়ে হ্যামিল্টন নামের এক ছোটো শহরে একখানা ওয়ানরুম অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছে। সেখানেই চলে যাবে। পুরোনো বাড়িতে সে নাকি এখনও মাতুমাসীর গলার আওয়াজ আর পায়ের শব্দ শুনতে পায়। রাতে ঘুমোতে পারে না। জিনিসপত্র সবই প্রায় বিদেয় করেছে বাড়ি থেকে। সঙ্গী নেই বলে একটা কুকুর পুষছে আজকাল। খুব আনপপুলার, এখনও অহংকারী। অস্থিরতা বেড়েছে। সবচেয়ে ভয়ের কথা, স্বাস্থ্যটা গেছে ভেঙে।

এসব বলবে কি শর্মিষ্ঠাকে? বলার কোনও মানেই হয় না। শর্মিষ্ঠাও জিজ্ঞেস করবে না।

গুণগুন করে রতন কী যেন বলছে, ঠিক বুঝতে পারছে না তোতন। কিছু বলছো রতন? আজ্ঞে বলছিলাম কি, আতাপুর কি আর যাওয়া হয়ে উঠবে দাদা?

এত মায়া হল তোতনের ওর মুখখানা দেখে! বড্ড দমে গেছে। বুঝতে এখান থেকে তোতনকে নিয়ে যাওয়া তার কর্ম নয় বোধ হয়। কিছু ভালমন্দের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। অথচ তোতন গেলে রতনের কোনও বৈষয়িক লাভ নেই, কোনও অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না এমন কি শ্রেণীগত পার্থক্য থাকায় তোতনের সঙ্গে সমানে সমানে বসে যে আড্ডা দেবে সে সাহসও নেই। আমেরিকা থেকে নানারকমের উপহার এনেছিল তোতন। রতনকে এক প্যাকেট ব্লেড আর একটা আফটার শেভ লোশন দিয়েছিল। সেই সামান্য উপহার পেয়েই এমন বিগলিত হয়ে গিয়েছিল যে, বিকেলবেলাতেই দু সেরী হাঁড়িতে ভাল দৈ এবং অন্তত একশ টাকার রাবড়ি নিয়েই এসে পান্টা উপহার দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাল। সুতরাং বলতেই হয়, তোতনের কাছে ওর কোনও বৈষয়িক প্রত্যাশা নেই। তবু যে কেন নিজেদের গাঁয়ে নিয়ে যাওয়ার এত গভীর ইচ্ছে কে জানে!

শর্মিষ্ঠা আসবার আগেই অবশ্য ডাব এসে গেল। একজন মধ্যবয়সী ফর্সা লোক দুখানা ডাব দুজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, কাঠি তো নেই, অসুবিধে হবে।

কাঠি কী জিনিস তা না বুঝে তোতন মুখকাটা ডাবের জল মরুভূমির মতো শুষে নিল।

আর একটা দিই?

দিন। বাইরে দুটো ছেলে আছে, ভ্যানগাড়ি টেনে এনেছে যারা–

দিয়েছি। ওরা সব ঘরের ছেলে। আমি শর্মিষ্ঠার কাকা।

সম্মান দেখাতে একটু মাথা ঝাঁকাল তোতন। লোকটা শশব্যস্তে ডাব আনতে গেল।

দ্বিতীয় ডাব শেষ হওয়ার পর শর্মিষ্ঠা এল। হ্যাঁ, একটু সেজেই। চুল আঁচড়ানো, মুখে সামান্য একটু মেক আপ শাড়িটা নতুন করে জড়ানো। সে-ই শর্মিষ্ঠাই, শুধু পটভূমিটা এক নয় বলে তোতনের বুঝি মনে হচ্ছে অন্যরকম। নাকি অন্যরকমই?

ধাঁধাটা থেকে গেল এই মলিন ঘরদোর, অনুজ্জ্বল আলো, ঘেমো পরম, রতনের চঞ্চল চোখ সব কিছুই শর্মিষ্ঠাকে বুঝে নিতে বাধা দিচ্ছে।

কিন্তু এ সময়টা গুরুত্বপূর্ণ। সে ঠিক করে রেখেছিল, শর্মিষ্ঠার জিনিসগুলি হস্তান্তর করার সময় সে শর্মিষ্ঠাকে লক্ষ করবে। খুব ক্রিটিক্যাল লক্ষ করবে। জিনিসগুলির জন্য শর্মিষ্ঠা কি হামলে পড়বে বা খুব বেশী আগ্রহ দেখাবে, নাকি খুব নির্বিকার নিস্পৃহভাবে গ্রহণ করবে?

শর্মিষ্ঠা মুখোমুখি উঁচু চৌকির বিছানায় বসে সামান্য ঠ্যাং দোলাচ্ছিল। মুখে একটু হাসি।

ছোটো করে চুল ছেঁটেছেন, মুখটা কেমন তোম্বা হয়ে আছে, কী হয়েছে আপনার বলুন তো! দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ ঢেলে একটা ভালুকের খাঁচায় ঢুকিয়ে দিয়েছে আপনাকে!

না, মানে, ভাবছিলাম–

এত দিন পর দেখা হল, অথচ একটুও খুশি হননি তো আমাকে দেখে!

তোতন জানে, এর একটা জুৎসই জবাব আছে। কিন্তু এমনিই মন্দভাগ্য তার যে কিছুতেই সময়মতো জুৎসই জবাবগুলো তার মাথায় আসে না। পরে আসে, যখন দরকার নেই। এখন মুখে যা এল তা কথা নয়, বিগলিত রকমের একটা হাসি। অর্থহীন বোকা-হাসি। তবে এই অপ্রতিভ অবস্থার মধ্যেও সে লক্ষ করল, গয়নার কথা বা টাকার প্রসঙ্গ তুলছে না শর্মিষ্ঠা।

রতন গলা খাঁকারি দিল। অর্থপূর্ণ গলা খাঁকারি খুবই মিনমিনে গলায় বলল, বেলা হয়ে যাচ্ছে।

শর্মিষ্ঠা তার বিশাল বিস্ফারিত চোখ ফিরিয়ে একবার রতনকে দেখল, তারপর তোতনের দিকে চেয়ে বলল, স্নান খাওয়া সেরে নিন। তারপর আপনার সঙ্গে আজ আমি কলকাতায় ফিরব।

ফিরবেন! তোতন একটু অবাক হল যেন।

হ্যাঁ। আজই। যেন এই নিয়ে আর কারও কোনও প্রশ্নই থাকতে পারে না এমনতরো মুখের ভাব করে শর্মিষ্ঠা উঠে পড়ল, এখানে কিন্তু সেরকম স্নানঘর নেই। আর ডাইনিং টেবিলও নেই। কিন্তু ইমপ্রোভাইজেশন আছে। অসুবিধে হবে কিন্তু।

তোতন মাথা নেড়ে বলল, অসুবিধে নেই। কিন্তু আমার যে আর একটা প্রোগ্রাম ছিল। এই ছেলেটি রতন। এর খুবইচ্ছে ছিল এর গ্রাম আতাপুর থেকে একটু ঘুরে আসি।

শর্মিষ্ঠা নাক কুঁচকে রতনের দিকে চেয়ে রইল একটু। ঝাঁঝ দিয়ে বলল, কেন নিয়ে যাচ্ছেন বলুন তো। কী দেখাতে? আতাপুর একটা জায়গা!

একথায় একদম নিবে গেল রতন। মাথা নিচু করল।

শর্মিষ্ঠা তোতনের দিকে ফিরে বলে, আপনারও বলিহারি যাই। সুন্দরবন দেখতে এসেছেন বুঝি এখানে? এই গোটা তল্লাট জুড়ে জঙ্গলের নামগন্ধ নেই। সুন্দরবন দেখতে হলে স্পীডবোটে করে নদী থেকে দেখবেন। এখন উঠুন তো। বেলা হয়ে যাচ্ছে।

এরপর যেন আর কথা চলে না। রতনের সযত্নে রচিত প্ল্যান নস্যাৎ হয়ে গেল। শর্মিষ্ঠার সামনে পড়ে আর দ্বিরুক্তি করছে না রতন, ভাল মানুষের মতো মেনে নিচ্ছে। একথার পর নতমুখে উঠে পড়ল

শর্মিষ্ঠা একটা ধমক দিল রতনকে, উঠে পড়লেন যে বড়! না খেয়ে কারও যাওয়া চলবে না।

রতন বসে পড়ল

তোতন যেন এতক্ষণে স্বস্তি বোধ করল। এবং বুঝতে পারল, তার আতাপুর অবধি যাওয়ার কোনও ইচ্ছেই ছিল না। শর্মিষ্ঠার কাছ অবধিই তার আসার কথা। এখানেই দাঁড়ি। আর যাওয়ার মানেই হয় না।

।। দুই ।।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে নোটন নিজের ভুঁড়ি দেখছে। অবাক হয়ে দেখছে, বিরক্ত হয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে দেখছে। সে খাটের কিনারে বসে আছে, বিরক্তিকর নাইলনের মশারি সুড়সুড়ি দিচ্ছে পিঠে, সামনে ছড়ানো তার পায়জামা পরা দুই পা, পায়জামার কষির ওপর দিয়ে উপচে পড়ছে তার পেটের চর্বি। খামছে ধরে সে দেখল, অন্তত ইঞ্চি তিনেক নীরেট চর্বি। আজকাল শার্ট টাইট হচ্ছে প্যান্টও খোড়ার কাছে বড্ড সেঁটে থাকে। এসব হচ্ছেটা কী? হচ্ছেটা কী? হচ্ছেটা কী?

মশারি এমনও ফেলা। ভিতরে তার ধামসানো বিছানা। সুপারফাইন হালকা প্রিন্টের দামী বিদেশী বেডশীটে চক্কর চক্কর ঘামের ছাপ, বালিশ ঈষৎ সিক্ত। ফুল স্পিডে সারা রাত পাখা ঘোরে, তবু এত ঘাম কেন হয় তার? এত ঘাম হওয়া কি ভাল? নাকি হার্ট বেশী পরিশ্রম করছে? নাকি অন্য কিছু?

সামনেই আয়না। ঘুম থেকে উঠেই রোজ আয়নার মুখোমুখি হতে হয় তাকে। সে আয়নার পক্ষপাতী নয় এবং ও জায়গায় আয়নাটা সে টাঙায়ওনি। কিন্তু এ বাড়িতে জিনিসিপত্র এতই বেশী যে, কোনটা কোথায় রাখা যায় সেইটে নিয়ে প্রায়ই তুমুল বাকবিতণ্ডা বেঁধে যাচ্ছে। স্থানাভাবে এই আয়নটার অন্য দেয়াল জোটেনি। নোটনের বিছানার মুখোমুখি টাঙানো হয়েছে। নিজের মুখ দেখতে নোটন যে খুব ভালবাসে এমন নয়। কিন্তু রোজ সকালে উঠে দেখতে হচ্ছে বলে আজকাল তার অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু আয়নায় যা দেখছে তাতে খুশি হচ্ছে না সে। শরীর যেন উপচে পড়ছে চর্বিতে। থুঁতনির একটু পিছনে কি গলকম্বলের আভাস? পেটানো চেহারার সেই বুঁদুনি কি অনেকটাই ঢিলে হয়ে যায়নি? কিন্তু সবচেয়ে দুশ্চিন্তার বস্তু হল পেট, ফিগারের বারোটা বজাতে ভুঁড়ির জুড়ি নেই।

নোটন উঠল এবং চটি ঘষটাতে ঘষটাতে হলঘর ঘুম-ঘুম চোখ নিয়ে বাথরুমে ঢুকল। সকালে একটু জগিং করলে কেমন হয়? একটু-আধটু ফ্রি হ্যান্ড বা যোগ।

গিরিকে কিছু বলতে হয় না। বাথরুম থেকে বেরোলেই তার চায়ের কাপে চামচে নাড়ার শব্দ পাওয়া যায়। তবু রোজই এসময়ে বাচ্চা গলায় একটা হাঁক ছাড়ে নোটন, গিরি! চা!

গিরিবালা এ বাড়িতে সাত বছর আছে। একটা রেকর্ড। কোনও কাজের মেয়ে এতদিন একটানা কোনও কাজের বাড়িতে আজকাল আর থাকে না। মাঝবয়সী গিরিবালা আছে। কাজের মেয়ে বলে অবশ্য তাকে চেনা যায় না। পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে বয়স, রং কালো, মুখখান গোল এবং প্রায়সবসময়েই হাস্যময়। গিরিবালর সবচেয়ে বড়গুণ পরিস্কার-পরিচতা, সাদা খোলের কালোপেড়ে শাড়ি ছাড়া সে পরে না, অবশ্য রান্নাবান্না করার সময় ওপরে অ্যাপ্রন থাকে। সেগুলো সবসময়েই ধপধপে পরিস্কার। তার হাতে পায়ে কোনও ময়লা নেই, নখ নেই। বাসী কাপড় ছাড়া থেকে শুরু করে আরও অনেক ধরণের শুচিবায়ু তার আছে। এ বাড়ির লোকেদের সে ধমক-চমক করে ও বেশ খানিকটা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে তুলেছে হাগা কাপড়ে ঘরে আসা চলবে না, বাসী ছাড়তে হবে, এঁটো মানতে হবে, আরও কত কী।

গিরিবালা ছাড়া এ বাড়ি অচল।

চা নিয়ে এলে নোটন বলল, শোন গিরি, কাল থেকে আমার চায়ে চিনি দুধ বন্ধ। স্রেফ লিকার আর পাতিলেবুর রস।

কেন, তোমার আবার কী হল?

পায়েস-টায়েস একদম দিবি না। আজ থেকে দু বেলা রুটি।

কী হল তোমা বল তো মেজদা?

নোটন রোষ কষাচিত চোখে গিরির দিকে চেয়ে বলে, ভুঁড়ি হচ্ছে দেখছিস না! দিন দনি মুটিয়ে যাচ্ছ, তোরা কি অন্ধ যে দেখতে পাস না?

ওমা! মুটোলে কী হয়! কত মোটা লোক দাবড়ে বেড়াচ্ছে!

তোর মাথা। খাওয়া কনট্রোল না করলে চর্বি কনট্রোল করা অসম্ভব। দেখছিস কেমন উপচে পড়ছে ভুঁড়ি? আজকাল চলতে ফিরতে আমার পেট নড়ে। স্টোক হয়ে বা হার্ট অ্যাটাক হয়ে তোদের চোখের সামনে মব আর তোরা তাই দেখতে চাস?

আহা, সকালে উঠে দুর্গানাম করার আগে ওসব বলে কেউ? তোমার মতো পিচেশই শুধু বলতে পারে। যাও, চায়ের কাপ নিয়ে বাইরের ঘরে যাও তো, বিছনাটা টক করে তুলে দিয়ে যাই।

না না,ওসব আজ থেকে তোর দরকার নেইত্র বাবুগিরি করে করেই আজ আমার এই দশা। আজ থেকে বিছানা আমি তুলব। একটু নড়াচড়া হবে। গিরি ফোঁস করল, তাহলে মেজদা, আমি ও বলি, বিছানা তুলে যা ব্যায়াম হবে তার চেয়ে ঢের বেশী হবে রোজ যদি বাজার করে, আর হপ্তায় হপ্তায় রেশন তোলো, আর বাগনে মাটি কোপাও।

নোটন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ঠিক আছে, আজকের দিনটা তুই-ই বিছানা তোল, কাল থেকে কিন্তু আমি।

চা খেতে খেতে বাইরের হলঘরে এসে নোটন দেয়ালজোড়া বিশল খোলা দরজাটা দিয়ে বাইরের লন দেখতে পেল। পওলো ছয় কাঠা জমির লন এবং একটা আভিজাত্যর্পণ সমাবেশ বাইর থেকে দেকলে এ এক্কেবরে মারহাব্বা বড়লোকের বাড়ি। কিন্তু যতটা মনে হয় ততটা নয় তারা। হলঘরে ওই বিটকেল বিরাট দরজাটা করিয়েছিল নোটনের ভাই তোতন। সে এদেশে থাকে না, কিন্তু মাঝে মাঝে এসে এরকম সব হঠাৎ ঠিক করল বাগানের দিকের দেয়ালটা ভেঙে ফেলতে হবে। সেখানে থাকবে একটা ফোল্ডিং দরজা, যা ভাঁজ করে করে পুরোটাই খুলে দেওয়া যাবে। ঘর আর বাগনের পার্থক্য ঘোচাতেই তার ওই উদ্যম। তারপর যা হয়, দরজাটা আর কখনোই পুরোটা খোলা হয় না। কিন্তু আজ হয়েছে।

চা খেতে খেতে উদোম জায়গাটার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায় নোটন। বৃষ্টি হয়ে গেছে রাতে, বাগানটা কী সবুজ! কোথাও মাটি দেখা যায়না, ঘাসের য়েকে আছে সবটুকু। ডনদিকে দেয়াল ঘেঁষে একটা ছোটো কদম গাছে কী অসম্ভব কদম ফুটেছে!

শূন্য চায়ের পেয়ালা সেন্টার টেবিলে রেখ নোটন বাইরে বেরিয়ে এল!

বাড়ির পিছন দিকে ঝিঙে মাচর অবনীবাবু মাটি উসকোচ্ছেন বা ঝিঙের গুণমান নিরীক্ষণ করছেন। রিটায়ার করার পরএখন বাগানেই তাঁর সময় কাটে। তবে বাগনের নেশা তাঁর বরাবরই ছিল। আমেরিকায় গিয়ে ছেলের বাড়ির সামনের এবং পিছনের লনে যে ফুল ফুটেয়েছিলেন তা দেখে ছেলের এক মার্কিন বন্ধু বলেছিলম, এ কালার রায়ট। রঙঙর দাঙ্গা।

নোটন ডাকল, বাব, কী করছেন?

অবনীরবাবু খুবই আনমনা গলায় বললেন, এই তো। তারপর, তোমার কী খবর?

ইদানিং আপনি আমার চেহারাটা দেখেছেন? ইজ ইট প্রেজেন্টবল?

দেখছি। মোটা হচ্ছো তো! তা আর কী করা যাবে? তুমি মোহনবাগান ক্লাবের মেম্বার, কোন টেনিস ক্লাবের সদস্য, কোন সুইমিং ক্লাবের কর্মকর্তা, তোমার তো এ দশা হওয়া উচি নয়।

আপনি কি করে ট্রিম থাকেন?

আমার কথা বাদ দাও। আমাদের বংশটাই চিমসে ধাতের। তুমি পেয়েছো তোমার মামাবাড়ির ধাত। ওঁরা একটু মোটার দিকে।

ওটা কোনও কথা নয়। আমার ধাত আপনার মতোই হওয়ার কথা। আমি যে গাদা গাদা খাই। যা পাই খাই। খেতে আমার ভীষণ ভাল লাগে

সে তো ভাল কথা। খাওয়া কিচু খারাপ ব্যাপারও তো নয় মস্ত আনন্দেরই ব্যাপার। তবে খাওয়টা যাতে তোমাকে না খায় তার জন্য শরীরের বাড়তি চিনিটা পুড়িয়ে ফেলা দরকার।

ব্যায়ম! সেটাই ভাবছি। কিন্তু পারবো কি? সময়য় হয় তো ইচ্ছে হয় না, ইচ্ছে যায় তো সময় পাই না। ওইটেই তো মুশকিল।

ভাল কথা। তবে তুমি তো বোধহয় পায়েস ভালোবাসো।

ওঃ, ওটাই তো আমাকে খেলো। পায়েস! পায়েসের জন্যই বোধহয় বেঁচে থাকা!

চার পাঁচটা ঝিঙে তুলে হাতে নিয়ে মাচানের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এলেন অবনীবাবুর সবই মাঝারি। রং না। কালো, উচ্চতা মাঝারি, স্বাস্থ্য মাঝারি। ভীড়ের মধ্যে নজরে পড়বার মতো চেহারা নয়। বয়স সত্তরের কাছেপিঠে হতে পারে। পরনে ধুতি এবং একটা হাতাওয়ালা গেঞ্জী। একসময়ে পাক্কা সাহেব ছিলেন। থ্রি পিস স্যুট, টাই, বো এখনও ট্রাংক বাক্সে পড়ে আছে বেশ কয়েকটা। বিশেষ করে অজস্র টাই। ইংরিজি পালেপার্বণে ওই এক বস্তু প্রচুর উপহার পাওয়া যেত ইংরেজ আমলে। ইদানীং সেগুলো সমূলে বর্জন করেছেন। বেশ কয়েকটা হ্যাট ছিল, সেগুলো বাড়ির ছোটোরা পরে পরে নষ্ট করেছে।

ঝিঙে তুলে নোটনকে দেখিয়ে বললেন, নিজের হাতে ফলানো জিনিসের স্বাদ আলাদা। ভাতে দিয়ে খেতে অতি চমৎকার।

নোটন বিরস মুখে বলে, আপনি আমাকে ঝিঙে চেনাচ্ছেন বাবা? ঝিঙে কি আমরা বিস্তর খাই না? বাজারে কি প্রচুর ঝিঙে ওঠে না? মায়ের হাতের ঝিঙে-পোস্তা যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খাদ্য সেও কি আমরা জানি না?

অবনীবাবু একটু তচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেন, ঝিঙে পোস্তা! ওটা কি একটা খাদ্য হল? ঝিঙে পাতুরি খেয়েছো? নারকোল আর সর্ষেবাটা দিয়ে চাপটা মতো করতে হয়। ওই পাতুরি দিয়েই একথালা ভাত তুলে ফেলা যায়। তোমার মা শিখেছিলেন তাঁর শাশুড়ির কাছে। কেন যেন আজকাল আর করতে চান না সেটা। পাতুরির একটা কায়দা আছে, পুরো চাপটাটা কড়াই ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে উল্টে দিতে হয়। তোমার মায়ের শ্যাতে আর্থারাইটিস, তাই বোধহয় পেরে ওঠেন না।

ডগিং-টগিং আমার পোষাবে না বাবা। খাওয়া কন্ট্রোল করাও আমার কর্ম নয়। এছাড়া আর কোনও পথ নেই?

সংযম আর পরিশ্রম– এ ছাড়া মানুষের আর কোন মূলধন আছে তা তো জানা নেই। তবে ওই সায়ান্সওলাদের জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। কত নতুন নতুন নিদান তো বেরোচ্ছে।

আপনিও তো বিজ্ঞানের লোক।

সেসব পুরোনো বিজ্ঞান, এ যুগে অচল। ভুলেও গেছি সব। তোমার এমন কি মেদবৃদ্ধি হল তা তো বোঝা যাচ্ছে না। একটু উনিশ-বিশ হয়ে থাকতে পারে। দুশ্চিন্তার কিছু নেই।

মাথা নেড়ে নোটন বলে, আপনি বুঝছেন না বাবা, এ জিনিস একবার হওয়া খাওয়া শুরু করলে ঠেকানো মুশকিল। আমি বড্ড খাই যে। ভীষণ খাই। কপালটাও খাওয়ার। ভাল ভাল হোটেলে ডিনার থেতে হয় পার্টি লেগেই আছে।

অবনীবাবু স্মিতমুখে বললেন, হোটেলে খাওয়া খুব ভাল জিনিস নয়। খাওয়া ছাড়াও আনুষঙ্গিক জিনিস আছে। এক পেগ হুইস্কিতে কত ক্যালোরি থেকে জানো?

নোটন এবার দৃশ্যতই অস্বস্তিতে পড়ল। হুইস্কি সে খায় বটে, কিন্তু অবনীবাবুর সেটা না-জানার ভান করা উচিত। এদেশে সেটাই নিয়ম। নোটন একটা ভ্রু-রু-ত শব্দ করল। হয়তো ঢেঁকুর, হয়তো ওটাও একটা এক্সপ্রেশন।

ছেলের অস্বস্তি লক্ষ করেই অবনীবাবু বললেন, আজ বিকেলের দিকে বরানগরে মেয়িটিকে দেখে আসবে নাকি? তোমার মা আর বোনেরা যাচ্ছেন। আমার ইচ্ছে একজন পুরুষমানুষও যাক, দুরকম দৃষ্টিভঙ্গিতো বিচারটা ভাল হয়।

কাহিল মুখে নোটন বলে, আবার আমি কেন বাবা? আমি ব্যাচেলর মানুষ, এসবের কীই বা বুঝি?

ভাইয়ের জন্য পাত্রী দেখতে যাবে তাতে তো তোমার ব্যাচেলরশিপ ক্ষুণ্ণ হবে না। ব্যাপারটা তাড়াতাড়িই ঘটানো দরকার। তোমার মা কিন্তু উদ্বিগ্ন, আর এই উদ্বেগে পড়ে উনি হয়তো বাছাবাছি বা ভালমন্দ বিচার করবেন না। সেই জন্যই তোমাকে সঙ্গে যেতে বলি।

নোটন যথেষ্ট সিরিয়াস মুখ করে বলে, উদ্বেগের যা কারণ শুনলাম সেটা তেমন ভাবার মতো কিছু নয়। মেয়েটা তো এখনও ডিভোর্স দেয়নি।

ডিভোর্স না দিলেই কি আর নিশ্চিত থাকা ভাল? আইন আদালতের ব্যাপার দুদিন পরে হলেও হবে। ইতিমধ্যে তো আর নর-নারীর সম্পর্ক থেমে থাকবে না। আজকাল সকলেই অপরিণামদর্শী। তোমার ভাইটি আবার একটু দার্শনিক টাইপের। বাস্তববোধ কম।

বাবা, তোতন আমেরিকায় থাকে। বাস্তববোধ কম হলে ওখানে চলে না। আপনি তো সব নিজেই চোখেই দেখে এসেছেন।

দেখেছি বলেই বলছি। আমেরিকায় তোমার ভাই সত্যিই অচল। ড্রাইভিং লইসেন্স নিতে ভুলে যায়, ক্রেডিট কার্ড বাড়িতে রেখে দোকানপাটে গিয়ে লজ্জায় পড়ে, অফিসের কাজেও নিশ্চয়ই গাফিলাতি আছে, নইলে এতদিন তার ম্যানেজেরিয়াল র‍্যাংকে যাওয়ার কথা।

ঠিক আছে। যাবো।

সবচেয়ে চিন্তার কথা হল, কলকাতার ফ্ল্যাটে মেয়েটি একা থাকে এবং তোমার ভাই সেখানে যাতায়াত করে।

সামান্য বুক চিতিয়ে নোটন বলে, যদি বলেন তা মেয়েটিকে একটু কড়কে দিতে পারি।

অবনীবাবু অবাক হয়ে বলেন, গুন্ডা লাগাবে নাকি? ওসব করতে যেও না, হিতে বিপরীত হবে। এসব ঠিক গাজোয়ারি ব্যাপারে নয়। তার চেয়ে বিয়ে দিয়ে দিলে ল্যাটা চুকে যাবে।

এবার কি আর হবে? তোতনের ছুটি তো ফুরিয়ে এল।

বিয়ে ঠিক হলে ছুটি বাড়াতে পারবে। তোমার মা চাপাচাপি করায় স্বীকারও হয়েছে। কিন্তু অল্প সময়ে একটা ভাল পাত্রী জোটানোই কঠিন। আজকের বিকেলটা ফ্রি থেকো।

নিশ্চয়ই বাবা। তবে আমার কিন্তু মেয়ে দেখার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। কোন কোন পয়েন্টে ভাল-মন্দ বিচার করব তা তো জানি না।

ব্যাপারটা কেমন সেটা আঁচ করার চেষ্টা কোরো। আর দেখতে হয় পরিবার। চারদিকে লক্ষ রেখো। কে কিরকম আচরণ করছে, সহবৎ জানে কিনা, বিনয়টা সহজাত কিনা, নাকি অভিনয় করছে

এসব বিচার করে দেখবে। শুধু দায়সারা ভাবে ঘাড় নিচু করে বসে থেকো না। দেখার চোখ থাকলে সামান্য সামান্য ব্যাপার দেখেও অনেকটা আঁচ করা যায়।

এ পর্যন্ত তো পাঁচ ছ'টি দেখা হয়েছে বোধহয়। কোনওটাই পছন্দ হয়নি নাকি?

তা নয়। শতকরা হিসেবে কোনোওটা পঁচিশ ভাগ, কোনওটা পঞ্চাশ ভাগ পছন্দ হয়ে আছে। তোমার বোনের ষোল আনা সন্তুষ্ট নয়, তারা আরও কয়েটা দেখতে চায়।

আপনি নিজে দেখলেই তো হয়। আমাদের সিলেকশনে ভুল থাকতে পারে।

অবনীবাবু মাথা নেড়ে বললেন, সেটা ভাল দেখায় না। আর আমারও আর এসব ব্যাপারে থাকতে ইচ্ছে যায় না। আজকাল দেখছি পুরুষরা যখন ওল্ড টাইমার হয় তখন তাদের মতামতের মূল্য কমে যায়।

নোটন কৃত্রিম বিষণতা মাখানো গলায় বলে, সংসারে ব্যাচেলরদেরও মতামতের তেমন কোনও মূল্য নেই বাবা।

অবনীবাবু হাসলেন। বললেন, তাতহলে ব্যাচেলর থাকার দরকারটাই বা কি? সাধন ভজন কছো না, দেশের কাজ করছো না, অথচ ব্যাচেলর থাছো এটা তো মিনিংসে হয়ে যাচ্ছে।

এ কথাটার জবাব দেওয়ার মানেই হয় না। নোটনের কোনও জবাব নেইও। সে ঝিওঙ কটা হাত বাড়িয়ে অবনীরবাবুর হাত থেকে নিয়ে বলল, আপনার হাতের ফলন খুব ভাল বাবা। ঝিঙের সাইজটা দারুণ হয়েছে।

অবনীরবাবু এখন বাগানেই থাকবেন। নোটন ঝিঙে হাতে দোলাতে দোলাতে লন পার হয়ে হলঘরে ঢুকল। সেন্টার টেবিলে ঝিঙে রেখে ষাঁড়ের মতো চেঁচাল, গিরি! এই গিরি!

গিরিবালা রান্না ঘর থেকে বেরোতেই সেনঅর টেবিলে দিকে আঙুল দেখিয়ে নোটন বলে, ভিঙে। তুই পাতুরি করতে পারিস?

গিরিবালা বিরক্ত হয়ে বলে, ওগুলো কি ওখানে রাখার জিনিস? তোমার আক্কেল দেখে বলিহারি যাই

তুই পাতুরি করতে জানিস কিনা বল।

না বাপু, জানি না।

কিছুই তো জানিস না দেখছি। চাকরিটা বহাল রেখেছিস কি করে?

আর একটা গিরিবালঅ জুটিয়ে আনো, তারপর ওকথা বলো। পাতুরি-মাতুরি সব বাঙালদেশের নরান্না। ওসব আমি জান না।

শিকবি তো! ঝিঙে দিয়ে কভ কী হয়! তুই জানস শুধু ঝিঙে পোস্ত।

ঝিঙে পোস্ততে আবার কবে থেকে অরুচি হল তোমার? দিব্যি তো দেখি চেটেপুটে খাও।

তা বলে ভ্যারাইটি থাকবে না? তোর কোনও ইমাজিনেশন নেই।

নেই তো নেই। বলে গজ গজ করতে করতে গিরিবালা ঝিঙেগুলো তুলে নিয়ে রান্নাঘরে সেঁধোলো সোফায় বসে সামনে ঠ্যাং ছড়িয়ে দিয়ে নোটন কিছুক্ষণ বিড়বিড় করল, ঝিঙে পোস্তা ঝিঙে পোস্ত!

নোটনের জগৎ খেলাময়। ফুটবল,ক্রিকেট,টেনিস, তো আছেই, এমন কি সে রাগবি না বেসবলেরও খবর রাখে। খো- খো, কাবডি, জেলাওয়রি স্পোর্টস কিছুই তার ভাবনার জগতের বাইরে নয়। জ্যোৎস্না দেবী, অর্থাৎ তার মা, প্রাই বলেন, খেলাই তোকে খেলো।

দোতালায় একটা চমৎকার ল্যাভিং মতা বানানো হয়েছে। এটাও তোতনের প্ল্যান। বছর দুই আগে দোতালার দুটো ঘর ভেঙে এই ল্যাভিং করা হয়েছে। ফুলের টব, সোফাসেট দিয়ে দিব্যি সজানো। একধারে টিভি, দেয়ালের র‍্যাকেটে বসানো স্টিরিও। নোটন সকাল এই চমৎকার জায়গাটায় বসে খবরের কাগজ পড়ে এবং টিভি-র ইংরিজি খবর শোনে।

আজকের খবরের কাগজে পাতাটা বড্ড ম্যাড়ম্যাড়ে। তেমন কিছু নেই যা নোটন ইতিমধ্যেই জানে না। টিভির খবরটাও নিতান্তই জোলো লাগল। ধাক্কা দেওয়ার মতো খবর নেই।

খবরের কাগজ আবার ভাঁজ করে রেখে দিয়ে এবং টিভি বন্ধ করে নোটন কিছুক্ষণ ভীষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারল, দোষটা খবরের কাগজ বা টিভি-র নয়। তার মন যে কোথাও বসছে না তার কারণ একটা চাপা উদ্বেগ। বিকেলে পাত্রী দেখতে যেতে হবে—এই দুশ্চিন্তাই তাকে আনমনা রেখেছে।

মেয়েদের সম্পর্কে নোটনের এই সঙ্কোচ আর মৃদু ভয় এ জন্মে যাবে না। বড্ড ড়েড়ে বসে গেছে। বাবার কথায় রাজি হল বটে, কিন্তু এখন তার দুশ্চিন্তা দেখা দিচ্ছে। এর কোনও ধরা-ছোঁয়ার মতো কারণ নেই। কিন্তু মহিলা-ঘটিত যে- কোনও ব্যাপার থেকেই সে শত হস্ত তফাতে

ল্যাভিং-এর রেলিং-এ ভর দিয়ে নিচের দিকে চেয়ে নোটন একটা হাঁক মারল, ব্রেকফাস্ট কী হচ্ছে রে গিরি?

গিরি রান্নাঘরের দরজা দিয়ে মুখ বের করে বলে, ডিম হচ্ছে। আর টোস্ট।

দূর দূর! তার চেয়ে একটু কচুরি-টচুরি কতে পরতিস তো! রবিবারটা মাঠে মারা গেল।

কচুরি খাবে সো আগে বলতে হয়।

বলাল না যে, তোর ইমাজিনেশন্ নেই! রাবিবারের ব্রেকফাস্ট শুধু ডিম আর পাঁউরুটি? ছ্যাঃ ছ্যাঃ।

তা মাকে গেয়ে বলো না। আমি কি নিজে থেকে করেছি।

মা? বলে হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হাসল নোটন, মার কথা বলিসনি। আমেরিকা থেকে সাহেব ছেলে এসেছে তো, তাই সাহেবী খান হুকুম করে বসে আছে।

আহা, তোতন কি কলকাতায় আছে নাকি? সে তো কাল ধানবাদে পিসির বাড়ি গেছে।

তাহলে সাহেবী খান কর জন্য হচ্ছে শুনি!

এসব হাঁকডাক ছাদের ঠাকুরঘর অবধি ঠিক পৌছে গেল। জ্যোৎস্নাময়ী অর্থাৎ নোটনের মা এ সময়ে ঠাকুরঘরে থাকেন। গীতার একটি অধ্যায় গদ্যানুবাদ সহ না পড়ে ঠাকুরঘর ছাড়েন না।

পড়া শেষ করে প্রণাম করার সময় ছেলের হাঁকডাক কানে গেলে সংসার জায়গাটা যে কত খারাপ, কত তুচ্ছ জিনিসে ভরা, কত পাপে আকীর্ণ তা জ্যোৎস্নার চেয়ে ভাল আর কে জানে! তিনি প্রণামটা তেমন ভক্তির সঙ্গে শেষ করতে পারলেন না। অপোগণ্ড ছেলেটার আবার অপছন্দের কী হল? তিনি তাড়াতাড়ি নেমে এলেন।

ল্যাভিং থেকেই অনুচ্চ স্বরে বললেন, ও গিরি! কচুরিই কর মা। একটু খাটুনি বাড়ল তোর, তা দুপুরের মাংসটা না হয় আমিই রান্না করব। পুজোর কাপড়টা ছেড়ে আসছি দাঁড়া।

গিরি নিচে থেকে জবাব দিল, খাটুনির ভয় করি নাকি? তাহলে কি এ বাড়িতে টিকতে পারতাম; শুধু বলি বড্ড আসকারা দিচ্ছো। এই তো সকালে বাবু বললেন খওয়া কমাবেন, ভুঁড়ি হচ্ছে। এখনই আবার কচুরির বায়না। ঝিড়ে পাতুরি খেতে চাইছে।

গিরি একটট্ গজগজ করে ঠিকই, আবার যা সেই করেও দেয়। বিশেষ করে নোটনেরটা। অপোগণ্ড বলেই বোধহয় তার উপর সকলের একটু মায়া আছে।

ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে জ্যোৎস্না ছেলের দিকে একবার তাকালেন, বড্ড বায়না করিস।

ভ্রূ কুঁচকে মায়ের দিকে চেয়ে নোটন বলে, খাওয়া ছাড়া আর কোন ব্যাপারে তোমাদের জ্বালাই বলো তো। আমার মতো লক্ষ্মী ছেলে পাবে?

হ্যাঁ, খুব লক্ষ্মী। সেই জন্যেই তো- বলে আর কথা খুঁজে না পেয়ে জ্যোৎস্না ঘরে গেলেন।

নোটন অবশ্য পুরো ব্যাপারটাই দু' সেকেন্ডে ভুলে গেল। ফিরে এল সেই দুশ্চিন্তাটা। আজ তোতনের পাত্রী দখতে যেতে হবে। কোনও রোমন্টিক ব্যাপার নয়। পাত্রী দেখা মানে অনেকটা বেছেটেছে খাশীর মাংস কেনার মতোই ব্যাপার। আর এ হল ভাবী চ্যাঁ-ভ্যাঁ, ঝগড়া কাজিয়া, বায়নাক্কা-ন্যাকামি, রান্না-বান্না এইসব নিয়ে জেবড়ে ধকর মুখপাত্র মাত্র। মাঝে মাঝে নোটন ভেবে পায় না সে বিবাহিত লোকদের ঘেন্না করে কিনা।

ওই ছেলে-কোলে তার বোন মিন্টি এল। আলুথালু চেহারা। চুল, নাইট, মুখচোখ সবই যেন অগোছালো। গত সাত দিন তহল বাপের বড়িতে এসে বসে আছে, আমেরিকা থেকে ভাই এসেছে

বলে। ছুতো পেলেই চলে আসে। কোমরে চর্বি জমেছে, বিয়ের আগে যে কাটা - কাটা ধারাল মুখচোখ এবং বুদ্ধির দীপ্ত ছিল তা সবই এক সুখসন্তোষজনিত মেদ-বাহুল্যে ডুবে গেছে।

ছোড়দা, একটু ধরো না গো বাচ্চাকে।

বিয়ে-টিয়ে পছন্দ না করলেও নোটন বাচ্চাদে রখুবই পছন্দ করে।

শিশুরাই তার এতই প্রিয় যে ফুটপাতের ভিখিরির বাচ্ছা দেখলে অবধি সে দু' মিনিট দাঁড়িয়ে যায়। এক আশ্চর্যের ব্যাপার,বাচ্চারাও তাকে খুবই পছন্দ করে। মিন্টির এই এক বছর বয়সী ছেলেটা অসম্ভব মা-ন্যাওটা। কারও কাছে যায় না। কিন্তু নোটন হাত বাড়ালেই ঝাঁপ খেয়ে চলে আসে।

বাচ্চাটাকে চালান করে এখন অনেকক্ষণের মতো হাওয়া হবে মিন্টি। সেটা টের পেয়ে নোটন বলে, ধরছি, কিন্তু বাথরুম থেকে একটু তাড়াতাড়ি আসিস। আমি বেরোবো।

আচ্ছা বাবা, আচ্ছা।

শিশুদের গায়ে স্বর্গের গন্ধ অস্ফুট কথা আর শব্দে সংগীতের ধ্বনি। দুনিয়াটা এদের জন্যেই যা একটু ভাল লাগে নোটনের।

বাচ্চাটা কোলে এসেই নোটনের নাক খামছে ধরে 'আম আম' করে কি বলতে চেষ্টা করছে। নোটন টের পেল, বাচ্চাটার নখ বড় হয়েছে। নাকের নুনছাল উঠে গেল বোধহয় এই হচ্ছে আজকালকার যুগে মা, বাচ্চার দিকের খেয়ালই নেই। নিজেদের নখে বাচ্চারা নিজেরাই ক্ষতবিক্ষত হয়।

নোটনের ঘরে এসে তার ড্রয়ার থেকে একটা নেল-কাটার বের করল। তারপর অখণ্ড মনোযোগে ভাগ্নের নখ কাটতে বসে গেল। বাচ্চাটাও বসে রইল তার কোলে, চুপ করে। বিস্ময়ে দেখতে লাগল তার হাত নিয়ে কী একটা হচ্ছে।

এইসব ছোটখাটো কারণের জন্যেই না পৃথিবীতে বেঁচে থাকা।

বেঁচে থাকার ও কয়েকটা ছোটখাটো কারণ আছে নোটনের। তার মধ্যে একটা হল জনসংযোগ তার পরিচিতির পরিধি বিশাল। এবং বাড়ির পিছন দিককার বিরাট বস্তি অঞ্চলে তার বদান্যতা ও সাহায্যের খ্যাতি বেশ ব্যাপক। বাচ্চাটাকে বেশীক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করে আদর করা হল না নোটনের। বস্তির নারায়ণ এসে খবর দিল, কানাইয়ের ঠাকুর্দা মরেছে। ঘাট-খরচার জোগাড় নেই।

না থাকারই কথা। কানাইয়ের বাপ চোলাইয়ের ঠেক চালাত। ক্লাবের ছেলেরা নোটনের নেতৃত্বেই ঠেক বাঙে। কানাইয়ের বাপ কালাচাঁদ সহজে ছাড়েনি, দলবল নিয়ে হামলাবাজি করায় পুলিশ ধরে। তারপর কী হয়েছিল ঠিক জানে না নোটন। তবে জেল হাজতে লোকটা গলায় গামছা দিয়ে মরে। কেউ বলে খুন, কেউ আত্মহত্যা। ইতিমধ্যে কালাচাঁদের বউ অন্য জায়গায় বিয়ে বসেছে। তার নতুন বর ছেলে নিতে চায়নি। অগত্যা কালাচাঁদের বুড়ো বাপ হরিপদর ঘাড়েই নাতির দায় পড়ল। খুবই খারাপ অবস্থা গেছে তখন। বাচ্চাটাকে মিন্টির হতে চালান করে নোটন গায়ে জামা চড়িয়ে বলল, চল, দেখি গে।

গিরিবালা চেঁচাল, ও কি গো ছোড়দা, কচুরি করতে বললে যে! নেচি হয়ে গেছে, গরম ভেজে দিচ্ছি, খেয়ে যাও।

আসছি টপ করে।

গিরিবালা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এসে খাবে? মড়া ছুঁয়ে এলে চান করতে হয় তা জানো?

জ্বালাস নে। কচুরির চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার আছে দুনিয়ায়, বুঝলি?

নোটন বেরিয়ে যাওয়ার পর জ্যোৎস্নাময়ী নামলেন।

গিরিবালা আর্তনাদ করে উঠল, ও মা, ওই দেখ আমি কাঁড়ি কচুরির জোগাড় করে বসলুম তোমারা চেলে বস্তির মড়া পোড়াতে চলে গেল।

জ্যোৎস্নাময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ওই জন্যেই তো বিয়ে করতে চায় না। উড়নচণ্ডীপানা চলবে না যে। বউ হলে টিট থকত। কখন ফিরবে?

আর ফিরেছে! মড়াটড়া ছুয়ে আসবে মা, জামাকপড় না ছেড়েই বসে যাবে খেতে, ও অনাচারি মানুষকে বিশ্বাস কি? বড্ড অনাচার তোমার বাড়িতে।

অত বাছবিচার করতে যাস কেন? দেখিনা- দেখিনা ভাব করে থাকতে পারিস না? আমি তো তাই করি! সব বাছবিচার মানতে গেলে কি আর মা হয়ে থাকতে পারতুম? এক একটা এক এক রকম, কাকে ফেলি বল। কথাও কি শোনে!

এত কচুরির এখন কী হবে?

এলে খাবে। নইলে ভূতভূজ্যিতে লাগাবি।

ওই একটি ছেলের জন্যে মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস জমা আছে বুকে। উনচল্লিশ বছর বয়সের ধাড়ি ছেলে। এখনও ন্যাবলক একনও শিশু।

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ইদানিং জমেছে তোতনের জন্যে। কী হবে মা মঙ্গলচণ্ডী জানেন। কিন্তু যা হচ্ছে তা ভাবলে বুক শুকিয়ে যায়। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়ে কে জানে! পরের জন্যে আর মা হবেন না জ্যোৎস্নাময়ী। হলে বাবা হবেন ছেলেদের সংসার-সন্তান ভুলে দিব্যি মজে আছেন বাগান নিয়ে, ওরকম থাকতে পারলে জ্যোৎস্নাময়ীর আরাম হত।

মনটায় সব সময়ে একটা ভার চেপে আছে। উৎকণ্ঠায় রাতের ঘুম ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়। আমেরিকা অনেক দূরের দেশ, সেখানে চোখের আড়ালে কী হয়েছে না হয়েছে তা কে বলবে? জ্যোৎস্নাময়ী দু'বার আমেরিকা গেছেন। শেষ বার গেছেন বছর চারেক আগে। তখনও তোতন তোতনের মতোই ছিল। একা, ভাবুক ঝঞ্ঝাটহীন। যা কিছু ঘটেছে গত বছর তিনেকের মধ্যে। মরার আগে মাস্তদি একটা দীর্ঘ চিঠি লিখেছিল জ্যোৎস্নাময়ীকে। তার ছেলের জীবন নাকি তোতনই নষ্ট করে দিয়েছে। সেই চিঠি আজও শক্তিশেলের মতো বুকে বিঁধে আছে। কত শাপাশাপান্ত না জানি মাস্তদি করে গেছে তোতনকে। শাপ-শাপান্ত কি ফলে না? নিশ্চয়ই ফলে। চঞ্চলজ্যায়। সংকোচে তোতনকে প্রায় কিছুই জিজ্ঞেস করা যায়নি। মিস্টি প্রসঙ্গটা তুলতে গিয়েছিল, ধমক খেয়েছে তোতনের কাছে। বান্টি, অর্থাৎ জ্যোৎস্নাময়ীর বড় মেয়ে মিস্টির চেয়ে বুদ্ধিমতী। সেও প্রসঙ্গ তোলেনি। তবে বিয়ের সম্বন্ধ করার আগে ভাইকে ভুলিয়ে ভালিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, তার পছন্দের কেই আছে কিনা। তোতন একটু ঝেঁকে জবাব দিয়েছে, কি থাকবে? ও জবাবটাও গোলমেলে।

শর্মিষ্ঠা খুব অচেনা মেয়ে নয়। মিস্টির স্কুলেই পড়ত, কয়েক ক্লাস নিচে। বিয়ের সময় দেখেছেন জ্যোৎস্নাময়ী। সেই মেয়ে যে এমন সাংঘাতিক শত্রু হয়ে দাড়াবে কে জানত? এসব কথা পাঁচকান করা যায় না, কিন্তু সমব্যথী তো চাই। বান্টি আর মিস্টির সঙ্গেই শুধু যা পরামর্শ করা যায়। কর্তাকে বলতে গিয়ে আহম্মক হতে হল। অবশ্য বললেন, শুধু মেয়েটিকে দুষছো কেন? পরের মেয়ে বলে? তোমার ছেলের দিকটা খতিয়ে দেখেছো? ফলে কর্তার সঙ্গে কথা চলেনি। নোটনকে বলতে গেলেন, নোটন হ্যাঃ হ্যাঃ করে হেসে বলল, তা করুক না শর্মিষ্ঠাকে বিয়ে। ডিভোর্স হয়ে যাক, তারপর রেজিস্ট্রি করে নিলেই হবে। আর যদি লিভিং টুগেদারও করতে চায় তো তাতেই বা আপত্তি কি? এই নারী প্রগতির যুগে তোমাদের এত কুসংস্কার কেন মা? জ্যোৎস্নাময়ী রেগে গিয়ে বলেছেন, ওরে, তোর চেয়ে তো আমি একটু বেশী মেয়েমানুষ, নাকি? নারী প্রগতি কাকে বলে তা আমি হাড়ে হাড়ে জানি। কিন্তু ও পাগলের সঙ্গে কথা কয়েও জ্যোৎস্নাময়ীর কোনও লাভ হয়নি। তোতন দেশে ফেরায় যেমন আনন্দ হচ্ছে, তেমনি দুশ্চিন্তাও বড় কম নয়। সেই মেয়েটা এখন তো এ দেশেই বসে আছে। এই তো তোতন তাকে ধরতে সোঁদরবন অবধি ঘুরে এল। রতনের কাছে শুনেছেন জ্যোৎস্নাময়ী তাতে বল ভরসা পাচ্ছেন না। দুটিতে নাকি খুব ভাব।

তবে আশার আলো একটাই। তোতন অনেক রাগ করেও বিয়েতে নিমরাজি হয়েছে। ঠাকুর-ঠাকুর বলে যদি বিয়েটা ঘটাতে পারেন তাহলে জ্যোৎস্নাময়ীর বুকটা জুড়োবে।

কিন্তু একটা মুশকিল হচ্ছে, ছেলের বিয়ে দেওয়ার ব্যাপ্ততায় এখন তিনি যে মেয়ে দেখছেন তাকেই পছন্দ করে ফেলেছেন। গত সপ্তাহে একটি শ্যামলা দাঁত উঁচু মেয়ে, একটি বেঁটে এবং

সামান্য ট্যারা মেয়েকে তিনি মোটামুটি পছন্দ করে মেয়েদের কাছে ধমক খেয়েছেন। বান্টি তো বলেছে, তুমি আর মেয়ে দেখো না তো মা। একেবারে ডোবাবে।

আজ বরানগরেরটা যদি পছন্দই হয় তাহলে বাঁচেন জ্যোৎস্না। রাস্তায় কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ যাদের দেখতে যাচ্ছেন তাদের কেউ তেমনটা চোখ লাগছে না। চেহারাটা আছে তো লেখাপড়া নেই, লেখাপড়া আছে তো স্মার্টনেস নেই, গান জানে তো চেহারা নেই। বড্ড জ্বালাতন হচ্ছেন জ্যোৎস্নাময়ী

পাগল ছেলেটা ফিরল বেলা আড়াইটেয়। আগে ছেলে না খেলে খেতেন না জ্যোৎস্নাময়ী, ভাত আগলে বসে থাকতেন কিছুকাল হল গ্যাসের ব্যথা ওঠায় এবং ছেলে ধমকটমক করায় বটে, কিন্তু সে ঠিক খাওয়া নয়। ভাত বসা মাত্র। আজ আরও অরুচি, বুকের ভিতর এক উদ্বেগ থাবা বসিয়ে রেখেছে বরানগরের মেয়েটা কেমন হবে? ভাল যেন হয় ঠাকুর।

খেয়ে উঠে দোতালার জানালায় পর্দার আড়ালে বসে উঁকি মেরে ছিলেন জ্যোৎস্নাময়ী। কলেই খেয়ে দেয়ে ছুটির দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছে। তিষ্টোতে পারেন না শুধু জ্যোৎস্নাময়ী। পাগলটার জন্য তো কেউ বসে নেই, ওর জন্য চিন্তাও নেই কারও।

ফটক খুলে উসকো-খুসকো চুল আর শুকনো মুখে ওই ঢুকল এসে। সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলে। কে জানে কে। জ্যোৎস্নাময়ী। নেমে এলেন নিচে। ওটা কে তোর সঙ্গে?

একগাল হেসে নোটন বলে, এটা মহা বিচ্ছু একটা ছেলে। কানাই। এরই ঠাকুর্না আজ মারা গেল। ক'দিন থাকুক, তারপর ওর মা এসে নিয়ে যাবে।

ওর মা কোথায়?

বজবজ না কোথায় যেন থাকে।

জ্যোৎস্নাময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এ কাণ্ড নতুন নয়। গরীব-দুঃখীর জন্যে ছোঁড়ার প্রাণ কাঁদে সেটা খারাপ নয়। কিন্তু এরকম একটা বিশিষ্ট অভিজাত বাড়ির অন্দরমহলে ও পাগলা যাদের মাঝে মধ্যে এনে হাজির করে, তাদের দেখলে শিউরে উঠতে হয় এমন হাকুচ নোংরা সব মানুষ। কিন্তু বুঝিয়ে, বকে, রাগ অভিমান করে কোনও লাভ হয়নি।

ও কি খাবে?

নোটন অবহেলায় বলল, খাবে বলে কি আর ভাত চড়াতে হবে নাকি? আমারটা আছে তাই থেকে ভাগ করে দেবো। অবহেলায় আমার ভরপেট খাওয়াও ঠিক হবে না।

মড়া ছুঁয়েছিস?

ইচ্ছে ছিল না। তবে বুড়োটা বড্ড গুণী ছিল। দারুণ আড়বাঁশি বাজাত। একসময়ে একটু শিখিয়েছিল আমাকে। তাই দোনোমোনো করে কাঁধটা দিয়েই ফেললুম। তাহলে হলঘরেই দাঁড়া। আগুন আর লোহা ছুঁতে হবে। আর ও ছোঁড়ার তো অশৌচ। ও তো মাছ-মাংসের ছোঁয়া খাবে না। হ্যাঁরে, মুড়ি-টুড়ি খেয়ে থাকতে পারবি?

খুব পারবে মা। এক ধামা মুড়ি-বাতাসাই দাও। জলে ভিজিয়ে মেরে দেবেখন।

এইসব ব্যবস্থা করতে দুপুর গড়িয়ে গেল। নোটন খেয়ে উঠতে উঠতে সোয়া তিনটে। হলঘরের দেয়ালঘড়ির দিকে চেয়ে জ্যোৎস্নাময়ী বললেন, তুইও নাকি বরানগরে যাবি আমদের সঙ্গে? হ্যাঁ মা। পিতৃআদেশে রাম বনবাসে গিয়েছিলেন। আমারও একরকম তাই যেতে হবে।

তাহলে আর শুয়েটুয়ে কাজ নেই। আমরা চারটের মধ্যে বেড়বো। কড়েয়া থেকে বান্টিকে তুলে নিতে হবে। তৈরী হয়ে নে।

তিনি যে আর বেশী দিন বাঁচবেন না এটা জ্যোৎস্নাময়ী আজকাল টের পাচ্ছেন। এত উদ্বেগ এত অশান্তি নিয়ে বেশী দিন কেউ বাঁচে না। আজকাল বুকের ভিতরটা সব সময়ে ধড়ফড় করে সবসময়ে শব্দ বুক শুকিয়ে থাকে এক অদ্ভুত তেষ্টায়। ঘুম কমে যাচ্ছে। খাওয়ায় অরুচি এভাবে কত দিন বাঁচে লোকে?

অথচ সুখের উপকরণের অভাব ছিল না জ্যোৎস্নাময়ীর।

।। তিন ।।

আজকাল আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করে না পরাণের। নিউ জার্সির ছোটো যে শহরে সে বাড়িখানা কিনেছে সেটা আমেরিকার আর পাঁচটা শহরের মতোই ছিমছাম, ছবির মতো সুন্দর। সুপার স্টোর আছে, টেনিস ক্লাব আছে, সুইমিং পুল আছে, বনভূমি আছে, বনভূমিতে হর্স রাইডিং, জগিং, ফরেস্ট ওয়াক সব আছে। তার বাড়িটা ছোট এবং যথারীতি চমৎকার। এখনও পরাণের দুটো গাড়ি। তার মায়ের ওল্ডমোবাইল এবং নিজের ভোলভো। তার পুরোনো চাকরিটা নেই। মাথার ঘন চুল নেই। সেই স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে অনেকদিন। আজকাল সে একা বাড়িতে ভয় পায়। ঘুম হয় না ভাল। নতুন যে চাকরিটা সে পেয়েছে সেটা ভাল নয়। অর্থাৎ তত ভাল নয়। এবং সে সেরকম মন প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে না। মনোযোগ জিনিসটাই সে হারিয়ে ফেলেছে ক্রমে। এসব কাটিয়ে ওঠার জন্য সে মাঝখানে মদ খাওয়া ধরেছিল। জীবনে খায়নি। তাই জোর করে খেতে গিয়ে সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ত। আজকাল খায় না। কিন্তু একটা কালো লোক তার কাছে প্রায়ই আসে এবং ধীরেধীরে ড্রাগ ধরতে বলে। সেই লোকটা হয়তো দয়ালু। সে বলে, ড্রাগ সম্পর্কে যে সব অপপ্রচার হচ্ছে তাতে ঘাবড়াতে নেই। মানুষকে তো কথা ভুলে থাকতে হবে। জীবন ক'দিনের বলো!

জীবন ক'দিনের তা আজকাল পরাগ ভাববার চেষ্টা করে।

এক বিষাদ উইক এন্ড শুরু হবে কাল। ক্লান্ত পরাগ তার ভোলভো চালিয়ে অফিস থেকে বাড়ি ফিরল। ফাঁকা বাড়ি। বাড়ির সামনে বিক্রি তার মায়ের ওল্ডমোবাইলটা অব্যবহৃত পড়ে আছে। বড় ভারী গাড়ি। আজও বিক্রি করা হয়ে ওঠেনি। ওল্ডমোবাইলের পাশেইনিজের গাড়ি খানা রেখে পরাগ সদর দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। রান্নার কথা ভাবলে তার মাথা গরম হয়ে যায়। ঘর পরিষ্কার করা, বাসন মাজা, কাপড় কাচা এর যে কোনও একটা কাজের যখনই প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই তার মাথায় খুন চাপে।

রোজ বাড়ি ফিরে পরাগ অত্যন্ত ক্লান্ত ভঙ্গুর শরীর নিয়ে বসে থাকে লিভিং রুমে। কখনও বাইরে জানালাপড়েই সোফায় শুয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকে। কখনও ঘুমিয়ে পড়ে এবং অসময়ে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে সভয়ে বসে থাকে।

টি ভি-তে সেক্স চ্যানেল চালিয়ে সে দেখছে। বিরক্তকর। তার আজকাল কোনও কামবোধ নেই। দুটি নগ্ন নরনারীর কৃত্তি দেখতে দেখতে তার মনে হয় এর কোনও মানে হয় না। এ ব্যাপারে সে খুব বেশী পটু নয় বলে সুস্পষ্ট অভিযোগ ছিল শর্মিষ্ঠার। সেই অপমান আজও তাকে ভীষণ ঠাণ্ডা করে রাখে।

ড্রাগ না ধরলেও আজকাল ঘুমের ওষুধ খায় পরাগ। ঘুম হয়না অবশ্য। কিন্তু শরীর ঝিমিয়ে থাকে। বছর খানেক আগে মেডিক্যাল চেক আপ-এ তার হার্টের গণ্ডগোল ধরা পড়েছিল। আর সে ডাক্তারের কাছে যায় না। যা খুশি হোক।

কাল থেকে দীর্ঘ ছুটির দিন। কী করবে পরাগ? আজকাল এদেশে তার কোনও বন্ধু জুটছে না। শর্মিষ্ঠাকে বাড়ি থেকে তাড়ানোর পর থেকেই সে ভীষণ আন-ওয়েলকাম সব জায়গায়। কোথও যায় না পরাগ। দু-একজন সাহেব বন্ধু ছিল। আজকাল তাদের সঙ্গেও মেশে না সে।

ফ্রিজে কিছুই থাকে না আজকাল। রাখাই হয় না। পরাগ কদাচিৎ জিনিসপত্র কেনে। আজ ফ্রিজ খুলে দেখল,পরশুর কেনা এক কার্টুন দুধ রয়েছে। খুলে সেটাই ঢকঢক করে খেয়ে নিল সে। ব্যস, আর ডিনারের ঝামেলা নেই। খাওয়া যে আজকাল শান্তি বিশেষ।

প্রত্যেকের জীবনই তার নিজের রকমের। বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সবকিছুর ওপর মানুষের হাত থাকে না। পরাগের ছোটো ভাই মারা যায় আট বছর বয়সে, কলকাতার রাস্তায় একটা অ্যাকসিডেন্টে। পরাগের জীবনের টার্নিং পয়েন্ট ওটাই। সেই থেকে তাকে আঁকড়ে ধরল। এমন ধরল যে, পরাগের আর স্বাধীন হওয়া হল না কখনও। ভাইটা যদি ওভাবে না মরত, বাবা যদি আজও বেঁচে থাকত, কিংবা আরও কয়েকটা ভাইবোন যদি থাকত তার, তাহলে ঠিক এরকম হতে পারত না। মা তার শত্রু ছিল না কখনও। কিন্তু হিংসুটে ছিল। বড্ড হিংসুটে।

শর্মিষ্ঠার কথা খুব কমই মনে পড়ে তার। পড়লে সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে রাগে। শুধু রাগে। এত অপমান তাকে কেউ কখনও করেনি। তুমি এর মতো নও, তুমি ওর মতোনও, তুমি কেমন যেন, আচ্ছা তোমার কি ইডিপাস কমপ্লেক্স আছে ? তুমি কি ইমপোটেন্ট ? আজকাল পরাগের বাড়িতে টেলিফোন বাজে না। কেউ তাকে রিং করে না, সেও কাউকে নয়। বোবা টেলিফোন পড়ে আছে বহুকাল।

আজ টি ভি খুলল পরাগ। নিউজ চ্যানেল। কিছু নেই। খুলল বাচ্চাদের চ্যানেল। কিছু দেখার মতো নয়। ওপরে শোওয়ার ঘর অবধি সে কদাচিৎ ওঠে। সোফায় শুয়ে রইল চুপচাপ। জামাকাপড় না ছেড়েই। তারপর অন্ধকারে জেগে থাকা আর জেগে থাকা। অন্ধকার হলেই চারদিকটায় কি যেন একটা ঘনিয়ে ওঠে। অশরীরী কিছু ? কেন যেন মনে হতে থাকে, কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে, অন্ধকারে তাকে তীব্র চোখে লক্ষ করছে, দাঁতে দাঁত পিষছে।

মামরে যাওয়ার পর থেকেই তার এটা হয়েছে। কুইনসের বাড়িতে এরকম হতে থাকায় সে বড় বাড়ি বিক্রি করে মফস্বলে চলে এল। কিন্তু লাভ হল না।

কে যেন বলে উঠল, ওরে বাবা!

কে! চমকে উঠল পরাগ। হৃৎপিণ্ড দুম দুম করে পাঁজরায় ঘা মারছে। জলতেষ্টা। মাথায় ঘূর্ণিঝড়। কে! কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মতো বসে থাকার পর সে হঠাৎ টের পেল, যা সে শুনেছে তা তার নিজেরই কণ্ঠস্বর।

সে কি একা কথা বলছে আজকাল ?

নিজের মাথা দুহাতে চেপে ধরে পরাগ। অন্ধকার তার ভাল লাগে না। কিন্তু আলোও কি লাগে ? একা থাকতে ভাল লাগে না। কিন্তু লোকজনও কি সহ্য হয়?

একাকের জন্য এদেশে ফলাও ব্যবস্থা আছে। টেলিফোন করলেই একজন কম্পানিয়ন চলে আসবে। ছেলে বা মেয়ে। ঘন্টাওয়ারি হিসেবে পয়সা নেবে। তারা নানা ছলাকলা জানে। নিঃসঙ্গ কোন মানুষকে কি ভাবে সঙ্গ দিতে হয় তার প্রশিক্ষণ নেওয়া আছে তাদের। আর শরীর! পরাগ শুনেছে, শরীরের ব্যাপারে তাদের মতো জ্ঞানী ও দক্ষ বিশেষ নেই।

এই ভূতুড়ে বাড়িতে একা থাকার চেয়ে একজন থাকা ভাল নয় কি? পরাগ অনেকবার ভেবেছে একজন ভাড়াটে নেবে। এই মফস্বলে ভাড়াটে জোটানো মুশকিল। জুটলেও ভাল লোক হবে কিনা কে জানে। আর ভাড়াটে এলেই যে তার সমস্যার সমাধান হবে তাও নয়।

কিন্তু এত কথা এখন ভাবতে তার ভাল লাগছে না। তার বুকজোড়া এক অতলান্ত ভয়, সে একা কথা কইছে কেন? সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?

ঘরময় পায়চারি করল পরাগ। পায়চারি করতে করতেই শুনতে পেল কে যেন বিড় বিড় কথা কইছে, আই হেট ইউ! আই ডেসপাইজ ইউ! আত্মহত্যা করতে পারো না? খুব ইজি। ড্রাগ! কী হবে অত ভেবে? শুরু করে দাও।

হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে সে নিজেই কথা কইছে। কিন্তু টের পাচ্ছে না। কথা বেরিয়ে যাচ্ছে মুখ দিয়ে। এ যেন দুটো মানুষ। একজন শুনছে, একজন কইছে।

পেটের মধ্যে একটা ঘুরপাক খাচ্ছে যেন হঠাৎ? মাথাটা ফার্নেশের মতো গরম লাগছে কেন? ঘাম হচ্ছে। দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে বেসিনে উপুড় হল সে, অম্বল সমেত দুধটা হড় হড় করে বেরিয়ে গেল।

সমস্ত বাড়ির বাতি জ্বালিয়ে দিল পরাগ। তারপর আবার সব বাতি নেবাল। শুল, উঠল, ফের শুল।

এভাবে চলে না। চলছে না। এক একটা রাত যে কিভাবে কাটে তার! একজন সঙ্গী চেয়ে দেখবে?

ডাইরেকটরি খুলে নম্বর বের করে ডায়ল করল সে। অল্পবয়সী একটি মেয়ে চাইল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল চুপচাপ। দেখা যাক, যদি অন্যরকম কিছু হয়।

পনেরো মিনিট পর ডোর বেল বাজল। দরজায় বিশালকায় এক কৃষ্ণাঙ্গ দাঁড়িয়ে, গায়ে চামড়ার জ্যাকেট। 'হাই' বলে একটা উইশ করল। তারপর বছর কুড়ির একটি দো-আঁশলা মেয়েকে শরীরের আড়াল থেকে এগিয়ে দিল তার দিকে। এদের কাছে মেয়েরা কমোডিটি।

চতুর একটু হেসে কৃষ্ণাঙ্গটি গিয়ে তার গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পর দরজা বন্ধ করে মেয়েটির দিকে ভাল করে তাকাল পরাগ। অল্প বয়সের একটা লাবণ্য আছেই। কিন্তু এত মেকআপ দিয়েছে যে মুখটাকে মুখোশ বলে মনে হচ্ছে।

বিরক্তির সঙ্গে সে বলে মেকআপ ধুয়ে এসো।

মেয়েটা সঙ্গে সঙ্গে অনুগতের মতো তাই করল। পরনের খাটো লাল শার্ট আর ফ্রেঞ্চিং জিনস্, মাথার চুল পনি টেল করা। মেক আপ তোলার পর মুখে মৃদু মেচেতা দেখা যাচ্ছে। একটু মদের গন্ধও আসছে তীব্র সেন্ট ছাপিয়ে।

কি বলবে মেয়েটি কে পরাগ? কি করবে একে নিয়ে? সারা রাতের মতো ভাড়া করা মেয়ে মানুষ, কিছু তো করা চাই। কিন্তু পরাগের শরীর এত মরে গেছে, এত পরিশ্রান্ত সে যে সেক্স-এর প্রশ্নই ওঠে না।

মে আই স্মোক?

পরাগ আঁতকে উঠে বলে, ওঃ নো, ডোন্ট। প্লীজ।

ইটস্ অঃ রাইট হানি, মে উই ড্রিংক এ লিটল্?

নো।

ইটস্ অঃ রাইট, নাউ হোয়াট আর ইউ গোয়িং টু ডু হানি? উঃ ইউ প্লে এ বিট অফ মিউজিক?

আই র‍্যাদার নাইক ইট কোয়াইট।

ফিলিং বোরড হানি?

মেয়েটি তার পাশে এসে গায়ে লেগে বসে ডান হাতে গালটা জড়িয়ে ধরে নাউ নাউ, ইউ আর কোয়াইট এ ম্যান। আই থিংক উই ক্যান মেক সাম ফান। কিস মি।

চুম্বন এত জ্বালাময় হতে পারে জানা ছিল না পরাগের। মেয়েটা দাঁত বসিয়ে দিচ্ছিল ঠোঁটে। এডসের ভয়ে মুখ সরিয়ে নিল পরাগ। হাঁফ ধরা গলায় বলে, লুক, আই ডোন্ট ওয়ান্ট সেক্স। জাস্ট কিপ মি কম্প্যানি অ্যান্ড উই উইল বি অল রাইট।

মেয়েটা অবাক হয়ে বলে, নো সেক্স হানি? বাই ক্যান মেক ইট এ প্লেজার। এ রিয়েল প্লেজার।

নো। বলে উঠে দাঁড়াল পরাগ। তারপর দৃঢ় পায়ে হেঁটে গিয়ে ওয়াল ক্যাবিনেট থেকে একটা হুইস্কির বোতল বের করে এনে মেয়েটার সামনে রেখে বলে, সাট ইওরসেল্ফ। দেন গো টু স্লিপ।

মেয়েটা কি বুঝল কে জানে। খুব বেশী মগজ বা ভাবাবেগ থাকেও না এদের। বোতলটা তুলে দেখে নিয়ে সহর্ষে বলে উঠল, হাই, ইটস্ গুড। রিয়েল গুড।

পরাগ একটা চেক কোটে এনে মেয়েটার হাতে দিয়ে বলল, ডোন্ট বদার মি ইন দা মর্নিং।

ডোন্ট ইউ লাইক মি সুইটহার্ট?

ইউ আর ফাইন। জাস্ট ফাইন। নাউ, বি এ গুড গার্ল অ্যান্ড লীভ মি অ্যালোন।

মেয়েটার কোনও বিস্ময় নেই। নানা মক্কেল চড়িয়ে অভ্যাস হয়ে গেছে। পরাগকে ছেড়ে মেয়েটা তৃষ্ণার্তের মতো মদ খেল। কিন্তু ভাল প্রশিক্ষণ থাকায় মাতাল হওয়ার আগেই থামল। পা থেকে জুতো খুলে সোফায় গুটিশুটি হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমন্ত মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে একটু দূরে সিঙ্গেল সোফায় বসে থাকে পরাগ।

কে যেন চাপা গলায় বলে উঠল, শয়তান! শয়তান! ইউ মাস্ট ডাই।

নিজের মুখে হাত চাপা দিল পরাগ। আতঙ্কে।

নিজের কাছ থেকে কি করে পালাবে পরাগ তা বুঝে উঠতে পারছে না। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? কী নাম যেন মেয়েটার! রিটা!

পরাগ বড় সোফার সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে চাপা তীব্র গলায় ডাকে, রিটা! রিটা! ওয়েক আপ, প্লীজ!

রিটা সাড়া দিল না। তবে ঘুমের মধ্যেই একটা আদুরে শব্দ করল। মেয়েটাকে জোটানোর কোনও মানেই হল না। বরং একটা অচেনা মেয়ের কাছে নানা অসতর্ক মুহূর্তে তার পাগলামীর লক্ষণ ধরা পড়ে যেতে পারে।

বাথরুমে ঢুকে ঠান্ডা-গরম শাওয়ার ভাল করে অ্যাডজাস্ট না করেই সে খুলে দিল। বরফ-ঠান্ডা জল তাকে চমকে শিউরে অসাড় করে দিচ্ছিল প্রায়। কোনও রকমে নব অ্যাডজাস্ট করে বহুক্ষণ স্নান করল সে। স্নান করতে করতেই সে এক টুকরো কবিতা, একটু গানের কলি এবং দু-চারটে অর্থহীন কথা শুনতে পেল। এ সবই তার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে। সে নয়, তার অভ্যন্তরে যেন আর একটা লোক ঢুকে বসে আছে।

গা মাথা মুছে লিভিংরুমে এসে দেখতে পেল বাইরে খুব ভোরের একটা ময়ূরকণ্ঠী রং ধরেছে আকাশ।এখনও তারা আছে কিন্তু ফিকে হচ্ছে। তার মনে পড়ল,প্রথম আমেরিকায় এসে যে নিউইয়র্কের রবীনবাবুদের বাড়ি কিছুদিন পেয়িং গেস্ট ছিল। থাকত বেসমেন্টে। কাছেই সেন্ট্রাল পার্ক। রোজ ভোরে রবীনবাবুর ছেলে অমিতাভর বাইকটা নিয়ে সে চলে যেত পার্কে। দৌড়োতো, ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করত। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, সেন্ট্রাল পার্কের সেই আশ্চর্য ভোর। সে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত। সেন্ট্রাল পার্কই তাকে শেখায় আমেরিকার প্রেমে পড়তে।

বহুকাল পর আবার তার সেন্ট্রাল পার্কের ভোরের স্মৃতি মনে পড়ছে। এ কথা ঠিক, সেন্ট্রাল পার্কের ভোর আজও হয়তো আগের মতোই সুন্দর আছে। কিন্তু তার যে দেখবার চোখ নেই। একবার কি যাবে পরাগ? দেখে আসবে আগের মতোই ভাল লাগে কিনা!

মেয়েটার দিকে ফের তাকায় সে। ও কি চোর? হলেও খুব ক্ষতির ভয় নেই। পরাগের সামান্য কিছু ডলার আছে। নিলে নেবে। দশ ডলারের একখানা নোট সেন্টার টেবিলে মেয়েটার নাকরে ডগায় রেখে দিল সে। সঙ্গে একটা চিরকুট, ইওর টিপস। থ্যাংক ইউ ফর এভরিথিং।

দৌড়ানোর জুতো, পুরোনো শর্টস সবই ওয়ার্ডরোব থেকে বেরোলো। দ্রুত পোশাক পরে নেয় পরাগ। তারপর বেরিয়ে পড়ে।

এই ভোর-রাতেও আমেরিকার হাইওয়েতে গাড়ির ভীড় কিছু কম নয়। আমেরিকায় হাইওয়েতে চব্বিশ ঘন্টাই গাড়ির স্রোত বয়ে যায়। আজ উইক এন্ডের ভোরে সেটা মিছিলের চেহারা নিয়েছে। মোবাইল হাউস, বোটিং বা মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়ে গাড়ির পর গাড়ি বেরিয়ে পড়েছে নানা দিকে যাবে বলে। সমুদ্র, লেক, পাহাড়, অরণ্য কোনওটাতেই মার্কিনদের অরুচি নেই। তবে নিউইয়র্কের দিকে গাড়ির সংখ্যা বেশী নয়। রাস্তাটা ফাঁকাই গেল পরাগ। আশি নব্বই মাইল গতি তুলে দিল গাড়িতে। এত ভোরে পুলিশ বোধহয় খুব তৎপর নেই। থাকলেও বয়েই গেছে পরাগের। টিকেট খাবে তো! বহোৎ আচ্ছা।

লিঙ্কন টানেল ধরে হাডসন নদী পেরিয়ে থার্ড নাইনথ্ স্ট্রিট। তারপর পার্ক অ্যাভেনিউ। সোজা নাক বরাবর উত্তরে এগিয়ে যেতে লাগল পরাগ। নাইনটি সিক্সথ্ স্ট্রিটে বাঁয়ে মোড় নিল। ঢুকে পড়ল সেন্ট্রাল পার্কের উত্তরাংশে। সেই অতিকায় অরণ্যভূমি, সবুজ, ঘাসের মাঠ, সেই অনবদ্য প্রকৃতির ছোঁয়া, সব আছে। আজ উইক এন্ডে স্বাস্থ্যান্বেষী মানুষের কিছু অভাব। তা সত্ত্বেও জগার আছে, আছে ভবঘুরে নিষ্কর্মরা।

গাড়ি পার্ক করে পরাগ নেমে পড়ল। এখন আর দৌড়ানোর দম নেই তার। হাতে গায়ে সেই জোর নেই।বুকে উৎসাহ নেই। নির্ঘুম চোখ। কচকচ করছে জ্বালায়। বহুদিন ভাল করে খায়নি বলে শরীর দুর্বল।

সেই অনবদ্য ভোর। আলো ফুটছে, পাখি জমছে, ঘাস মাটির গন্ধ আসছে। একটি শর্টস পরা যুবতি মেয়ে কাছ ঘেঁষে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। দীঘল সতেজ চেহারা, লম্বা বিনুনি দুলছে পিঠের ওপর।

ওই মেয়েটাকে আমি ধরে ফেলতে পারবো কি? একটু ইতস্তত করল সে। তারপর দুর্বল পায়ে হঠাৎ ছুটতে শুরু করল। হাঁটু ভেঙে এল কয়েক কদম যেতে না যেতেই। বুক ব্যথিয়ে উঠল। দম আটকে আসতে থাকল গলায়। মাথা টলমল! চোখের দৃষ্টি হঠাৎ আবছা হয়ে এল। তবু পরাগ ধপ ধপ করে পা ফেলে নিতান্ত সদ্য-হাঁটতে-শেখা শিশুর মতো দৌড়োতে থাকল। কিংবা সেটা আদৌ দৌড়ই নয়। দৌড়ের ক্যারিকেচার।

মানুষ ছোটে কোনও লক্ষের পিছনে। আজ সকালে পরাগ ছুটছে দামাল, দক্ষ দৌড়বাজ ওই মেয়েটার সঙ্গে পাল্লা টানতে। এর কোনও মানেই হয় না। কিছুতেই পরাগ ওকে ধরতে পারবে না। ইতিমধ্যেই ও একশো গজ এগিয়ে গেছে। এবং পার্কের ঘনায়মান কুয়াশা ওকে গ্রাস করে নিচ্ছে। সামনেই একটা বাঁক। মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে যাবে।

প্রাণপণে পরাগ ছুটতে লাগল। মেয়েটা বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেল বটে, কিন্তু পরাগ জানে বাঁকের পর একটা সোজা স্ট্রিপ আছে। বাঁক ঘুরলেই মেয়েটাকে।

আবার দেখতে পাবে পরাগ।

কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, হেল্প! ওঃ গড!

কে! পরাগ থমকে দাঁড়াল। সে নিজেই কি? না, এ তো মেয়ের গলা! বিভ্রান্ত পরাগ ছুটে বাঁকটা অতিক্রম করল। না, সোজা স্ট্রিপটায় মেয়েটা নেই। কোথায় গেল তবে?

তার উদ্‌ভ্রান্ত মাথা কিছুক্ষণ কাজ করল না। তারপর করল। কাছেই ইস্ট হারলেম। কৃষ্ণাঙ্গ কিছু পাজি লোক সেন্ট্রাল পার্কটাকে তাদের কব্জায় রেখেছে অনেকদিন। মাঝে মাঝে ঘটনা ঘটে।

পরাগ রাস্তা ছেড়ে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে ঘাসের ওপর নেমে গেল। নিউ ইয়র্কাররা এসব ঘটনা চোখ বুজে এড়িয়ে যায়। যা হচ্ছে হোক। চুরি, ছিনতাই, ধর্ষণ যা খুশি হোক, নিউ ইয়র্কের লোকেরা গা করবে না। আপনি বাঁচলে খুড়োর নাম।

মস্ত স্ট্রবেরির একটা ঝোপের পিছনে চারজন কালো যুবক ধরেছে মেয়েটাকে। গায়ের কামিজ উড়ে গেছে, শর্টস ধরে টানছে। আর দুজন পিছন থেকে ধরে মুখ চেপে রেখেছে মেয়েটার।

স্টপ! স্টপ! ইউ রাসকেলস্! বলে পরাগ দৌড়ে গিয়ে প্রথমে যে যুবকটিকে পেল তাকেই একখানা লাথি কষাল। দ্বিতীয় জনকে একখানা ঘুঁষি।

এত আচমকা অপ্রত্যাশিত হামলায় চারজনই ভীষণ অবাক হয়ে গেল। লাথি বা ঘুঁষিতে তাদের কিছুই হয় নি। কিন্তু বিস্ময় হয়েছে।

মেয়েটাকে ছেড়ে তারা চারজনই ফিরে দাঁড়ল পরাগের দিকে।

স্কাউন্ড্রেলস্! বলে চারজনের দিকে নিজেকে নিক্ষেপ করে পরাগ। এ একরকম আত্মহত্যাই। মরতে তো হতই পরাগকে। এভাবেই না হয় মরল।

আশ্চর্যের বিষয়, ছেলেগুলো নয়, পরাগই আগে মারল। তার ঘুঁষিটা আটকানোর কোনও চেষ্টাই করল না অগ্রগামী প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা ছেলেটি। হারলেমের রাস্তায় রাস্তায় তারা নিত্য মারপিট করে, খুন-খারাপি করে, চুরি, ছিনতাই করে, সাবওয়েতে নিত্য যাত্রীরা তাদের ভয়ে তটস্থ। সুতরাং পরাগের ঘুঁষি আটকানোর চেষ্টা করা তাদের কাছে হাস্যকর। ছেলেটা প্যান্টের দু পকেটে হাত ভরে রেখেছিল। হাত বের করল না, শুধু পা তুলে পরাগের পাঁজরায় একটি লাথি মারল।

মড়াৎ করে একটা শব্দ হয়ে থাকবে। পরাগ প্রায় শুন্যে উঠে ছিটকে গেল অনেকটা দূর। ঘাসের ওপর পড়ে ঝিম হয়ে গেল কয়েক সেকেন্ড। না, আহত হওয়া তার চলবে না। তাকে মরতে হবে। হামাগুড়ি দিয়ে ফের উঠে দাঁড়াল পরাগ। এবং আবার নিক্ষেপ করল নিজেকে। এ লড়াই জেতার লড়াই নয়, হারার লড়াইও নয় এ হল তার মরার লড়াই।

তার একটা ঘুঁষি হাওয়া কেটে বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু দ্বিতীয়টা লাগল। কোথায় লাগল, কার লাগল তা বুঝতে পারল না পরাগ। তার দরকারও নেই। এই খুনিয়াদের ক্ষেপিয়ে দেওয়াটাই তার কাজ। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম তার প্রত্যেকটা ঘুঁষিই লাগতে লাগল। তার তিনটে লাথিও বৃথা গেল না। তারপর আর হিসেব করল না পরাগ।

না, সে শুধু মারছেই না, মার খাচ্ছেও। তার দুর্বল শরীরের ওপর বয়ে যাচ্ছে মারের ঝড়, চারদিক থেকে। কিন্তু কিছু তেমন টের পাচ্ছে না সে। এ শরীর যেন তার নয়। দাঁত, নাক, কপাল কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। কিন্তু এ রক্ত যেন অন্য কারও।

কে যেন প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, হে ল্ প্ ! ওঃ গড, হেল্প্! দিস ইজ মার্ডার! কার গলা! সেই মেয়েটা! এখনও পালায়নি! কী বোকা! পরাগের হাত পা সব অসাড় হয়ে আসছে। মুছে যাচ্ছে চোখের আলো। মাথা ঝিমঝিম। সে কি ঘুমোবে? খুব টানা শান্ত নিরুদ্বেগ ঘুম! গা-ভরা ঘুম! মাথা-ভরা ঘুম! কতকাল ঘুমোয়নি পরাগ! সে শুয়ে পড়ল। চোখ বুজল। খুব বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল শিয়রের কাছে মা বসে আছে বুঝি!

মা, আমার বড় শিশু হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। একটুখানি একটা বাচ্চা—তোমার কোলে শুয়ে আছি। কেমন, মা? কেন বড় হলুম বলো তো! বড় হয়েই তো সব গুলিয়ে গেল মা! কী যে হল!

ঘুমো পরাগ। শান্ত হয়ে ঘুমো।

যাই মা। যাই। ঘুমের দেশে যাই। আলো নেই, অন্ধকার নেই। কিছু নেই। মরবার পর কি ওরকম? কিছু নেই, কেউ নেই! মরা মানে কি না হয়ে যাওয়া!

হ্যাঁ বাবা। বেশ মা, তাই ভাল। না হয়ে যাওয়া খুব ভাল। ডলার নেই, চাকরি নেই,গাড়ি নেই, ওপরে ওঠা নেই, নিচে নামা নেই, না মা?

হ্যাঁ। তাই।

বেশ মা, এরকমই ভাল। না হয়ে যেতেই তো চাই। না, একদম না। মা!

কি বাবা?

ও মেয়েটা বোধহয় চোর।

কোন মেয়েটা? তোর গাড়িতে যে শুয়ে আছে? দূর বোকা! কী নেবে তোর, নিক না। তোর আর কিছুই দরকার হবে না। শুধুই ঘুমিয়ে থাকবি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও তো বটে।

মেয়েটা চেচাচ্ছিল। পালাতে পারত, কিন্তু চূড়ান্ত অপমান এবং সম্ভাব্য মৃত্যুর হাত থেকে যে রোগা বিদেশী লোকটা তাকে বাঁচিয়েছে তাকে এভাবে ফেলে সে পালাতে চাইল না। চেঁচাতে লাগল, ইট ইজ মার্ডার! হেল্প্!

হারলেম-চষা চারজন কৃষ্ণাঙ্গ যুবকও বড় ঘাবড়ে গেছে। এ তাদের এলাকা। এখানে কখনও কোনও বীরপুরুষ তাদের সঙ্গে টাঁ ফোঁ করেনি। এ লোকটার হঠাৎ হল কী? কোত্থেকে এস জুটল? এ কি মেয়েটার বয়ফ্রেন্ড? কিন্তু বয়ফ্রেন্ডরাও তো এরকম সাহস দেখায় না আজকাল! চারজনের একজনের একটা দাঁত নড়ে রক্ত পড়ছে। একজনের চোখের কোল ফুলে গেছে। বাকি দুজন দৃশ্যত অক্ষত হলেও তারা দুজনেই পরাগের লাথি বা ঘুঁষি খেয়েছে। মারটা বড় কথা নয়। একজন রোগা দুর্বল লোক তাদের মতো অভ্যস্ত গুন্ডাকে আর কীই বা করতে পারে! কিন্তু গাটস্!

একটা ছেলে মেয়েটার ফিরে বলল,ইউ শাট আপ, উই আর নট গোয়িং টু ডু এনিথিং টু ইউ, ইউ কুড হ্যাভ টোল্ড আস দ্যাট ইউ গট এ বয় ফ্রেন্ড কামিং এলং। মেয়েটা ঝামরে উঠল, নট এ বয় ফ্রেন্ড, হি ইজ এ স্ট্রেঞ্জার, নাউ, উড ইউ স্ক্র্যাম!

ইয়াঃ সিস্টার।

বিস্মিত চার কৃষ্ণাঙ্গ যুবক ভূপতিত নিথর পরাগের দিকে একবার তাকিয়ে চটপট অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেয়েটা তার ছেড়া কামিজ গায়ে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল পরাগের পাশে, ওঃ ডিয়ার! টুক এ লট অফ বিটিংস্। মে বি ডেড। ও গড!

একে একে লোকজন জুটল। তারপ এক পুলিশ। তারপর অ্যাম্বুলেন্স। পাঁজরের চারটে হাড় ভাঙা, নাক থ্যাবড়ানো, চোয়ালের ডিসলোকেশন এবং প্রচুর রক্ত ক্ষরণ ছাড়াও গভীর অবসাদ স্নায়ু বৈকল্য পরাগকে প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল। চব্বিশ ঘন্টা তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হল। নাকে নল, শরীরে ড্রিপের ছুঁচ।

সেদিনকার সান্ধ্য দৈনিকে ছোটো করে খবরটা বেরোলো বিভিন্ন কাগজে।

ইন্ডিয়ান সেভস্ এ গার্ল। ভায়োলেন্স ইন সেন্ট্রাল পার্ক। নিউ ইয়র্ক টাইমস্ এবং নিউ জার্সি আর পেন সিলভানিয়ার অনেক স্থানীয় কাগজে খবরটা বেরোচ্ছে অনেক বাঙালীর চোখে পড়ল।

তারপর একে-ওকে ফোন করে করে খবরটা চাউর করে দিল। পরাগ– সেই টোটালি ফ্রাষ্ট্রেটেড লোকটা– হিরো হয়ে যাচ্ছে নাকি? নিউ ইয়র্কের হাসপাতালে অনেকেই দেখতে গেল তাকে। পরাগ তখনও গভীরভাবে আচ্ছন্ন। প্রাণ সংশয়। দেখা হল না। তবে পরাগ ছোটো খাটো খবর হয়ে উঠল।

পরাগের সত্যিকারের জ্ঞান ফিরল তিন দিন বাদে। বিকেলে। শরীর অসাড়, মাথায় পাহাড়ের ভার, এক অতলান্ত ক্লান্তি আর শক্তিহীনতায় সে জড়বস্তুর মতো হয়ে আছে। মাথা বড় শূণ্য। সে নিজের নামটা পর্যন্ত মনে করতে পারছে না।

পঞ্চম দিনে সে একটু হেলান দিয়ে বসতে পারল। বুকের খাঁচা প্লাস্টারে মোড়া। শরীরের সর্বত্র ব্যথা আর ব্যথা। ব্যথা যেন শেষ নেই। ঘরে কিছু ফুলের বোকে সাজানো। তার মধ্যে একগুচ্ছ ভায়োলেট– যার দাম অনেক। এল ডাক্তার। এল পুলিশ।

বিকেল এল একটি মেয়ে।

হাই, আই অ্যাম স্টৈলা।

মাথা এখন কাজ করছে না। মেয়েটাকে সে চিনতে পারল না।

মেয়েটা একটা কেক এনেছে আর এক গোছা টাটকা ফুল। কেকটা তার হাতে দিয়ে বলে, আই বেক্‌ড ইট ফর ইউ। ডু ইউ রিমেম্বর মি? আই ওয়াজ দা গার্ল ইউ সেভড্।

পরাগ মাথা নাড়ল, আমি কিছু করিনি খুকি। তোমাকে বাঁচানোর জন্য নয়, আমি এ নিরন্তর একঘেয়েমির ঘেরাটোপ ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিলাম। আমি অর্থহীন এক বেঁচে থাকার হাত থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিলাম। আমি চেষ্টা করেছিলাম এ অভিনব আত্মহত্যা ঘটাতে। আত্মহত্যা এক পুরুষোচিত কাজ, সেটাই কি করে বীরত্ব হয়ে গেল দেখ।

অবশ্য এসব কথা সে মুখে উচ্চারণ করল না। সে শুধু মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বলল, ইট ওয়াজ নাথিং।

মেয়েটি দেখতে কেমন তা বুঝতে পারেনা পরাগ। অ্যাথলীটের মতো সুন্দর সতেজ শরীর। বেশ লম্বাও। তবে মুখখানা কিন্তু রুক্ষ। মেয়েটা লম্বা চুল রাখে। সোনালী আর সাদা স্টাইপের একখানা শার্ট আর জিনস্– এ ওকে খুবই তরুণী দেখাচ্ছে। বয়স হয়তো মেরে কেটে উনিশ–কুড়ি। ব্যাগ থেকে কয়েকটা খবরের কাগজ কাটিং বের করে তাকে দেখাল স্টৈলা ইউ আর নাউ এ সেলিব্রাইটি।

কাটিংগুলো দেখল পরাগ।দু-একটা কাগজে তার ছবিও দিয়েছে। হয়তো লাইসেন্স থেকে ফটো কপি করে নেওয়া। মেয়েটি বলে, চ্যানেল ফোর-এ তার ফটো দেখানো হয়েছে পরশুদিন। তারা পরাগের একটা ইন্টারভিউ-ও নেবে।

এসব কী হচ্ছে তা বুঝতে পারে না। তার ভারী ক্লান্ত লাগে। জীবনের অর্থ কি এরকম ফুরিয়ে যায়নি তার কাছে?

হাসপাতালে তাকে এখন প্রচুর পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো হচ্ছে। গাদা গাদা বলকারক ওষুধ আর ইঞ্জেকশন চলছে। তবু ভরা পেটেও মেয়েটির নিজের হাতে তৈরি করা কেকটি চমৎকার লাগে পরাগের। "ওঃ ইটস্ নাইস্, ভেরি টেস্টফুল।" বলায় মেয়েটি লজ্জায় খুশিতে ডগমগ করে ওঠে।

এরকম পরিস্থিতিতে পরাগের নিজের দেশে যদি কোনও মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হত তাহলে অবধারিত হয়ে উঠত একটা রোমান্টিক সম্পর্ক বা প্রেম। কিন্তু এখানে যা হয় তা হল সেক্স। এই মেয়েটি এক্ষুণি হয়তো পরাগের সঙ্গে বিছানায় যেতে হয়তো রাজি হয়ে যাবে। আর সেটাই ওদের কাছে প্রেম। মার্কিন প্রেমের মধ্যে রওয়া-সওয়া বড় একটা নেই। আছে কামের তাড়া। সেই জন্যই পরাগ পড়ি-পড়ি করেও শেষ অবধি কোনও মার্কিন মেয়ের প্রেমে নিজেকে জলাঞ্জলি দিতে পারেনি।

সে স্নিগ্ধ চোখ মেয়েটির দিকে চেয়ে বলে, ইউ আর এ নাইস গার্ল। ইউ আর এ নাইস ক্রেইচম্যান। মাই ড্যাড অ্যান্ড সিস্টার মে কাম টু সি ইউ।

মেয়েটি চলে গেলে পরাগ চোখ বুজে একটা গভীর শ্বাস ছাড়ল। অনেকদিন বাদে তার মনটা কিন্তু হালকা লাগছে।

বাঙালীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না পরাগের। পুরোনো বন্ধুরা এড়িয়ে চলত। একজন দুজন করে তারা এবার দেখা করে গেল। এর মধ্যেই চ্যানেল ফোর তার ইন্টারভিউ নিয়ে গেল। স্টেট

ইউনিভারসিটিতে পি-এইচ ডি করেছিল তারা দুজন। পরাগ আর অনিরুদ্ধ। ভীষণ বন্ধুত্ব ছিল তখন। অনিরুদ্ধ এখন বিরাট চাকরি করে বোস্টনে। সে এস বলল, তোর সম্পর্কে একটা অপপ্রচার শুনেছি। বোধহয় সেটা ওই মিটমিটে শয়তানটার কাজ। কী নাম যেন! তোতন না?

পরাগ হতাশায় হাত নেড়ে বলে, ওসব কথা থাক অনিরুদ্ধ। পাস্ট ইজ পাস্ট।

তোর কত ক্ষতি হয়ে গেল রে পরাগ! একটা কথা ফ্র্যাংকলি বলবি? শর্মিষ্ঠা কেমন ছিল? রিয়েল ব্যাড?

ও নামটা নিস না আমার সামনে। আমার প্রেশার বেড়ে যায়। এত রাগ!

পরাগ মাথা নাড়ল, না, রাগ নয়। আগে রাগ হত। আজকাল উল্টোটা হয়। নিজের ওপর ঘেন্না থাকে।

যাকগে। চ্যানেল ফোর-এ তোর ইন্টারভিউটা কিন্তু দারুণ হয়েছে। অল্প অল্প দাড়ি আর মাথা ব্যাভেজ থ্যায় বেশ যিশু খ্রিষ্টের মতো দেখাচ্ছিল তোকে। নন্দিতা তো বলেই ফেলল, এই ইন্টারভিউ দেখে অনেক মেয়ে পরাগদার প্রেমে পড়ে যাবে। বলেছিস বেশ। সেদিনদ সব বাঙালী বাড়িতে চ্যানেল ফোরই খোলা ছিল। খুব কথা হচ্ছে তোকে নিয়ে। এ হট সাবজেক্ট।

দিন পনেরো বাদে ভাঙচুর মেরামতের পর বানিকটা খুঁড়িয়ে এবং খানিকটা হাঁফিয়ে একটা লিমুজিনে চেপে বাড়ি ফিরে এল পরাগ।

অফিস থেকে হাসপাতালে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়েছে। তার দুজন কলিগ দেখাও করেছিল তার সঙ্গে। বাড়িতে ফেরার পর বিগ বস টেলিফোন করে তার দ্রুত আরোগ্য কামনা এবং অভিনন্দন জানালেন। মাসে একশো ডলারের একটা রেইজও পেয়ে গেছে সে। অনন্যা বউদি সাফার্ন থেকে এবং সুচেতা বউদি জার্সি সিটি থেকে ফোন করে জানতে চাইলেন, তাঁরা কয়েকদিনের জন্য এসে ঘরদোর সামলাবেন কিনা। পরাগ বলল, এখনও পারছি। কোনও অসুবিধে নেই।

সবচেয়ে বড় কথা, তার ঘুম হচ্ছে। ঘুমের ওষধ ছাড়াই। এবং সে আর আপন মনে কথা বলে উঠছে না। ফাঁকা বড়িতে যে একটা গা-ছমছমে ভাব ছিল সেটা কর্পূরের মতো উবে গেছে।

কুড়ি দিনের মাথায় নিজেই গাড়ি চালিয়ে অফিসে যাওয়া শুরু করল পরাগ। পর পর দুটো উইক এন্ডে পুরোনো চেনা-জানা বাঙালীর বাড়িতে তার নেমন্তন্ন হল। বিশেষ করে অনন্যা বউদির নেমন্তন্নটা হল সাংঘাতিক ভাল।

খাওয়ার পর বউদি আর অশোকদা বসলেন তাকে নিয়ে। অশোকদা জিজ্ঞেস করলেন, শর্মিষ্ঠা কি তোমাকে ডিভোর্স দিচ্ছে? পরাগ মাথা নেড়ে বলে, না।

আন্টিমেটলি দেবে, নাকি তোমাদের রি-ইউনিয়ন হবে? হলে অবশ্য সবচেয়ে খুশির খবর হবে সেটা।

কোনও সম্ভাবনা নেই অশোকদা।

হ্যাঁ, আমরা যা শুনেছি, ইট ওয়াজ টু মাচ। তাহলে ডিভোর্স দিচ্ছে না কেন? কোনও সেটলমেন্ট হয়নি?

পরাগ মাথা নিচু করে বসে রল কিছুক্ষণ। তারপর মনটা শক্ত করে মুখ তুলল। মৃদু স্বরে বলল, আমি ওকে ত্রিশ হাজার ডলার দিয়েছিলাম ডিভোর্স সেটলমেন্টের জন্য। সেই টাকাটা ওর অ্যাকউন্টে এখনও আমেরিকান এক্সপ্রেসে জমা আছে। কলকাতার ফ্লাট ওর নামে ট্রানস্ফার করে দিয়েছিলাম। তাও দেয়নি?

না। ও মার্কিন কোর্টে ডিভোর্স মামলা করতে চেয়েছিল তাতে ও অবশ্য আরও বেশী পেয়ে যেত আমি অনুরোধ করেছিলাম মামলাটা দেশে গিয়ে করতে।

তাই বা কেন? ওনলি টু কিপ দি ডিভোর্স সেটলমেন্ট ডাউন?

না অশোকদা, তা নয়। প্রথমত মা ডিভোর্স চায়নি। দ্বিতীয় কথা আমার ভয় ছিল, শর্মিষ্ঠা আর তোতনের ব্যাপারটা কোর্টে উঠবে।

সে তো এমনিতেই চাউর হয়ে গিয়েছিল

কি জানি কেন আমার খুব লজ্জা করত।

শর্মিষ্ঠাকে তোতন বিয়ে করছে তাহলে? কিন্তু তার আগে তো ওর ডিভোর্স দরকার।

হ্যাঁ। ও আড়াই লাখ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল। তোতনের হাত দিয়ে চেক পাঠিয়ে দিয়েছি। এবার ডিভোর্স দেওয়ার কথা। কিন্তু এসব কথা কেন অশোকদা? এমন চমৎকার লাঞ্চের পর এসব বিস্বাদ কথা কেন?

কারণ আছে।

অনন্যা বউদি সুপুরি কাটছিলেন। এখানে ডলারে চার পাঁচটার বেশী পাতাপান পাওয়া যায় না। তবু অনন্যা বউদী পানের অভ্যাস চাড়েননি। কার্পেটে বসে অনেকক্ষণ পরাগের দিকে এক দৃষ্টে চেয়েছিলেন একটু আগে। এবার বললেন, দাড়িটা কি রাখবে ভেবেছো?

পরাগ তার মাসখানেকের দাড়িতে একটু হাত বুলিয়ে বলে, থাক। কাটতে ইচ্ছে করছে না।

বেশ দেখায় কিন্তু তোমাকে দাড়ি রাখলে। রাখো, কেটো না। আর শোনো, লাঞ্চের প্রশংসা করলেই রেহাই পাচ্ছো না। আজ ডিনারও আছে।

না, আমি যাবো।

পাগল নাকি? কাল সারাদিন বেড়ানোর প্রোগ্রাম। সন্ধ্যেবেলা ডিনার খেয়ে কাল যাবে। মোটে তো ঘন্টা খানেকের রাস্তা।

একটা কিছু ষড়যন্ত্র আছে নাকি?

আছে।

পরাগ উদাস গলায় বলে, পাত্রী?

হ্যাঁ। ওরকম লক্ষীছাড়া হয়ে থাকবে কেন?

স্বামী হিসেবে আমার রেকর্ড ভাল নয় বউদি। খুব খারাপ। শর্মিষ্ঠা আমার হাতে মার খেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সে বলত আমি ইমপোটেন্টও।

শোনো বাপু, এসবই আমার জানা। মাত্তু মাসিমা যতদিন ছিল ততদিন তোমার হাতে রাশ ছিল না। মাত্তু মাসী ছিল ভীষণ পজেজিভটাইপ। অশান্তি যে হবে তা আমরা আগেই জানতাম। তোমার দাদাকে জিজ্ঞেস করো তোমার বিয়ের আগেই আমরা এ নিয়ে আলোচনা করতাম কিনা।

অশোকদা বললেন, শী ইজ রাইট। কিছু মনে কোরো না, মাত্তু মাসী ওয়াজ ইওর স্টাম্বলিং ব্লক। অবশ্য দোষ দিই না, একটা মাত্র সন্তান আঁকড়ে ধরে ছিলেন তো, ওঁর সাইকোলজিটা আমরা বুঝি। এনিওয়ে, শর্মিষ্ঠা আর তোতনও কাজটা ভাল করেনি। ইট ইজ ট্রেচারি।

পরাগের মুখে সাদটে ভাব দেখে অনন্যা বউদী স্বামীকে বললেন, ড্রপ ইট। ওসব আর না-ঘাটাই ভাল। যা হওয়ার হয়েছে। তা বলে তো আর একটা ছেলের জীবন নষ্ট তে দেওয়া যায় না।

পরাগ ম্লান হেসে বলে, নষ্ট! নষ্ট, ভ্রষ্ট, জরাগ্রস্ত কিছুই হতে আর বাকি নেই বউদি। আই অ্যাম এ গনার। এ কমপ্লিট ব্রেক অফ এ অ্যান।

মোটেই না। তাই যদি হত তাহলে সেন্ট্রাল পার্কের ঘটনা নিয়ে এত তুলকালাম বাঁধাতে পারতে না। চ্যানেল ফোর- প্রোগ্রামটা কী দারুণ হয়েছে।

পরাগকে কিছুই তেমন স্পর্শ করে না। ভারী উদাস লাগে। এরা ওই ঘটনার কত ভুল ব্যাখ্যা করছে!

তার চেয়েও বড় কথা হল, হাওয়া ঘুরছে। এতদিন পরাগ ছিল ভিলেন এখন ধীরে ধীরে কি ভিলেন হয়ে উঠবে তোতন? কিন্তু তাতে আর কী লাভ পরাগের? সে তো আর এই খেলায় ফিরবে না!

অনন্যা বউদি আর অশোকদাকে খানিকটা নিরাশ করেই ফিরে আসতে হল পরাগকে।

এখন আমেরিকায় চলছে বিখ্যাত ফল। গাছে গাছে বার্তা রটে গেছে, পাতা খসানোর সময় হয়েছে শুরু। সবুজ পাতা হয়ে উঠছে লাল, মেরুন, হলুদ,রঙে রঙে ছয়লাপ আমেরিকার অরণ্যবহুল প্রকৃতি। চারদিক যেন নানা রংয়ে এক ক্যালেডিওস্কোপ। খুব ভোরে উঠে পড়ে পরাগ। ডাক্তার তাকে নানারকম ব্যায়ামের উপদেশ দিয়েছে, দৌড়াতে বলেছে। কিন্তু তার জন্য, এই ফলড় অলৌকিক সৌন্দর্যই তাকে বোরবেলা টেনে আনে বাইরে। ঘরের কাছেই বনভূমি। সেখানে রয়েছে চমৎকার নির্জন দীর্ঘ জগারস্ ট্রেইল। পরাগ দৌড়োতে দৌড়োতে মাথা পরিষ্কার হয়ে যেতে থাকে। আজকাল অনেক কথা সে পারস্পর্য সহকারে ভাবতে পারে যা আগে পারত না। মন শান্ত হয়ে যায়। মাথা ঠাণ্ডা হতে থাকে। দৌড়োয় আরও অনেক। মুখোমুখি, চোখাচোখি হলেই পরস্পর বলে ওঠে 'হাই' বা 'গুড মর্নিং'। চেনা জানা থাক বা না থাক। আগে যান্ত্রিকভাবে হাই বা গুড মর্নিং বলত পরাগ আজকাল তা বলতে ভালই লাগে।

তার পাশের বাড়িতেই থাকে জন হিকস্। জনের বারো তেরো বছরের মেয়ে নিনার সঙ্গে আজকাল প্রায়ই দেখা হয়ে যায় পরাগের। দৌড়োতে দৌড়োতে মাঝে মাঝে পাশাপাশি চলে আসে মেয়েটা।

হাই রয়, গুড মর্নিং।

গুড মর্নিং নিনা।

আর ইউ ওকে নাউ?

কোয়াইট ওকে, থ্যাংক ইউ।

ইউ আর এ সেলিব্রাইটি, আই নো।

ইটস্ নাথিং মাই ডিয়ার।

কানট্ উই রান টুগেদার এভরি ডে?

হোয়াই নট?

ইউ লিভিং অ্যালোন নাউ?

ইয়া।

ভনঠ ইউ ডেট মি সাম ডে?

ওয়েল ওয়েল, আই উইল থিংক ইট ওভার।

মম্ সেজ ইউ আর এ লোনার। ইউ ডোন্ট লাইক গার্লস।

দ্যাটস্ নট্ টু।

নিতান্ত কিশোরীও ডেট করতে চাইছে তার সঙ্গে! পরাগ খাব হাসে আপন মনে।

সাড়ে সাতটার মধ্যে অফিসে বেরিয়ে পড়ে পরাগ। আজকাল কাজে ডুবে যেতে তার খুব অসুবিধে হয় না। মনটা সুস্থির রয়েছে ভারসাম্য আছে। কিন্তু এখনও তার জীবনের অনেক সূত্রে ঝুলে আছে এখানে সেখানে।

সব সমস্যার সমাধান তার পক্ষে তো সম্ভব নয়।

নিউ জার্সিস পুজো কমিটির মিটিং হয়ে গেল। একদিন যতীনদা টেলিফোন করে বললেন, ওরে এবার তোকে আমার একটা রিসেপশন দিচ্ছি।

রিসেপশন! কেন যতীনদা?

তুই যে হীরো বনে গেছিস?

কিসের হীরো! ওসব প্রচারে বিশ্বাস করবেন না। আমি ক্রনিক কাপুরুষ।

চ্যানেল ফোর বা নিউ ইয়র্ক টাইমস্ তো সে কথা বলছে না।

খবরটা যে কত ভুল তা যদি জানতেন!

সে যাই হোক, রিসেপশনটা হচ্ছে। তৈরী থাকিস।

সেন্ট্রাল পার্কে একটা মারপিটের ঘটান থেকে যে জল এতদূর গড়াবে এটা ভাবতে পেরেছিল। পরাগের ইচ্ছে ফরে হারলেমের সেই কালো গুণ্ডাদের পালে গিয়ে চুমু খেয়ে বলে আসে, সোনার চাঁদ ছেলেরা, তোমরা এরকম কাজ রোজ করে যাও গড ব্লেস ইউ।

পরাগ আজকাল খবরের কাগজ এবং বই পড়ে। গান শোনে। গান গায়। সে রোজ সাবান দিয়ে স্নান করছে। রাতে শোওয়ার আগে দাঁত মাজতে আর ভুল হচ্ছে না। সুপারস্টোরে গিয়ে আজকাল সে আনাজ ও অন্যান্য গেরস্থালীর জিনিস কিনছে। সপ্তাহে একদিন সে দাড়ি ও গোঁফ ট্রিম করে। জামাকাপড় কাচা ও ইস্তিরি করা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল পরাগ। আবার শুরু করল।

একথা ঠিক যে, সে অনেক গরিব হয়ে গেছে। শর্মিষ্ঠাকে আক্কেল সেলামী যা দিয়েছে তার ভার বহন করার মতো পকেটের জোর তার ছিল না। শুধু মায়ের হাত থেকে শর্মিষ্ঠাকে এবং শর্মিষ্ঠার হাত থেকে মাকে এবং নিজের হাত থেকে শর্মিষ্ঠাকে এবং শর্মিষ্ঠার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে সে বেকুবের মতো টাকা দিয়ে গেছে। এই ব্যাপারটা মা জানত না। সম্পর্ক যখন খরাপ থেকে খারাপতর-র দিকে যাচ্ছিল, যখন ঘরে মারদাঙ্গা এবং বিস্ফোরক মুহূর্তগুলি একের পর এক তৈরী হচ্ছিল তখন আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেনি পরাগ।

শর্মিষ্ঠা আজও ডিভোর্স দেয়নি। পরাগের অবশ্য আর প্রয়োজনও নেই। তাড়া তো নেই-ই। কিন্তু মেয়েটা তাকে যে যথেষ্ট ছিবড়ে করে ছেড়েছে তার সাক্ষ্য দিচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ধারকর্জের বহর। এ চোট সামলে ওঠা মুশকিল। কলকাতায় বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটটা হাতছাড়া হল। মা মাঝে মাঝে কলকাতায় গিয়ে থাকতে চাইতে বলে কেনা। তবে সেই ফ্ল্যাটের জন্যে তেমন দুঃখ নেই পরাগের। দেশে ফেরার বাসনা বা প্রয়োজন কোনওটাই নেই তার। সে বহুকালের গ্রীন কার্ডধারী। ইচ্ছে করলেই মার্কিন নাগরিকত্ব নিয়ে নিতে পারে। তাই নেবে। তার প্রয়োজনও খুব সীমাবদ্ধ একাকী জীবন কাটিয়ে দেওয়ার পক্ষে তেমন কঠিন কাজ হবে না। কিন্তু মুশকিল হবে শর্মিষ্ঠা আরও দাবী-দাওয়া তুললে। শর্মিষ্ঠার বাবা পরিতোষবাবু দুঁদে মানুষ। চাইলে আদায় করতে অসুবিধা হবে না। কারণ শর্মিষ্ঠাকে সে যা দিয়েছে তা তো আদালতের নির্দেশে নয়। সেগুলো অ্যালিমনি হিসেবে প্রমাণও করা যাবে না।

এটেই এখন পরাগের দুচিন্তার কারণ। ডিভোর্সের পর শর্মিষ্ঠা যত তাড়াতাড়ি তোতনকে বিয়ে করে ফেলে ততই পরাগের পক্ষে মঙ্গল।

মিনার সঙ্গে তোরের বনপথে দেখা হয় মাঝে মধ্যে।

ওল্ড ইউ ডেট মি?

ইয়াঃ। সাম ডে।

নেক্সট উইক এন্ড?

নো। নট দিস উইক এন্ড। সাম ডে। আই উইল মেক ইট।

ডোন্ট ইউ লাইক মি?

ওঃ, ইউ আর নাইস।

টুগেদা উই মে ডু সামথিং টেরিফিক।

অফকোর্স।

ওয়েল, বাই দেন।

বাই নিনা।

পরাগ ভারী অস্বস্তি বোধ করে। ওইটুকু মেয়ে। ডেট মানে তো 'স জানে। ছিঃ ছিঃ, ওইটুকু মেয়ে–! তবে আপাদমস্তক অবাক হয়ে সে একদিন টের পায়, কাম তাকে ছেড়ে যায়নি। শীতের সাপের মতো ঘুমিয়েছিল শুধু।

।। চার ।।

সকাল থেকেই বাড়িতে একটা সাজো-সাজো রব পড়ে গেছে। কোন ভেরে যশোধরাকে ঠেলে ঘুম থেকে তুলে দিয়েছে মা। সারা রাত ঘুমহীন অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়ে ভোর রাতেই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল যশোধরা। ভোরবেলা মা ডাকতে বড্ড আদুরে গলায় বলে, কেন ডাকছো মা?

ওঠ ওঠ। আজ দক্ষিণেশ্বরে পূজো দিতে যেতে হবে না?

উঠছি মা। আর পাঁচটা মিনিট।

মা আদর করে বলে, ওঠ মা। আর দেরী করলে ওদিকে বড্ড দেরী হয়ে যাবে। ছুটির দিনে মন্দিরে ভীষণ ভীড় হয় যে।

অন্য দিন হলে যশোধরা আরও কিছুক্ষণ ঠিক বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকত। কিন্তু হঠাৎ ধক করে মনে পড়ল, আজ তাকে দেখতে আসবে।

জীবনে এই প্রথম পাত্রপক্ষের সামনে বসবে যশোধরা। ভীষণ, খুব সাংঘাতিক এবং ঘোরতর আপত্তি ছিল তার। সে যুগ কি আর আছে নাকি যে, মেয়েরা বাজারি পণ্যের মতো পছন্দ হওয়ার জন্য সকলের সামনে গিয়ে গিয়ে বসবে!

তার এই তীব্র প্রতিবাদে বিব্রত হয়ে মা বলে, তাহলে পছন্দটা হবে কি করে বল! সে আমল নেই জানি। কিন্তু এখনও তো সেই আগের রীতিই চলছে।

ঝামরে উঠল যশোধরা, কেন চলবে? কেন চলতে দিচ্ছো তোমরা? ফটো দেখুক, কোয়লিফিকেশন জেনে নিক, তেমন দরকার পড়লে আড়ার থেকে পথে-ঘাটেও দেখে নিতে পারে। সেজেগুজে সামনে গিয়ে বসতে হবে কেন?

ধর না, আমাদের বাড়িতে বেড়াতেও তো আসে কত লোক। এও তেমনি পাড়া-প্রতিবেশীদের মতোই। আর সাজগোজ না করতে চাস করিস না। তোর আবার সাজের দরকার হয় নাকি?

খুব অয়েলিং শিখেছো! ওসবে আমি ভুলছি না। যদি ওরা পাত্রী দেখে, তোমরাও পাত্র দেখতে চাইবে।

ওমা! চাইবো না কেন? তোর বাপ জ্যাঠা ছাড়বার পাত্র কিনা। এখনও সেই জমিদারি নজর আছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। হিউস্টনে ট্রাঙ্ক কল করে অলককে বলা হয়েছে পাত্রের খোঁজ খবর নিতে।

যশোধরার যে বিয়ের ইচ্ছে নেই তা নয়। তবে বিয়ের সঙ্গে জড়িত অবমাননাকর কিছুই সে মানতে রাজি নয়। আমেরিকার পাত্র বলে ঢলে পড়বার মতো ন্যালাখ্যাপা সে নয়। যশোধরা জানে সে দারুণ সুশ্রী। তাদের জমিদারি গেছে বটে, কিন্তু লুকানো পেটিকায় যেমন পুরোনো মোহর আর সাবেক গয়না কিছু এখনও রয়ে গেছে, রয়ে গেছে কিছু চালচলন, তেমনি তাদের বংশের সকলের চেহারাতেই রয়ে গেছে সেই অভিজাত্যের কিছু নির্ভুল ছাপ। যশোধরা জানে সে সহজ সুন্দরী নয়, একটু ভাস্কর্যের আভাসও আছে তার চেহারায়। সুতরাং বিবাহ-বৈতরণী পার হতে তার কোনও কষ্ট হবে না। আর ওরকম পাত্রও তার মেলা জুটবে। তর বাপ জ্যাঠার খুব নাক উঁচু। যেমন তেমন পাত্রকে তারা পাত্তাও দেবে না। অনেক বেছে গুছে এই পাত্রটিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পাত্রের চেয়েও যশোধরার বাপ-জ্যাঠার বেশী পছন্দ পাত্রের পরিবারটি। বেশ বনেদী পরিবার। পাত্রের বাবা বরাবর ভাল চাকরি করতেন। কলকাতায় বিশাল বাগানওলা বাড়ি। পয়সা আছে, রুচি আছে, বনেদিয়ানা আছে, লায়াবিলিটিজ নেই। জ্যাঠামশাইয়ের এক বন্ধুর বন্ধু হলেন ভদ্রলোক। কিন্তু যশোধরার নিজেরও পছন্দ-অছন্দের কিছু ব্যাপার আছে। তর পছন্দ লম্বা পুরুষ। পুরুষালি পুরুষ। একটু আনমনা হবে আর বেশ উদার একদম কিপটে হবে না। স্ত্রৈণ হবে না।

ওদের বাড়িটা কেমন তা অবশ্য যশোধরা জানে না। বরানগর কুঠীঘাটে তাদের বাড়িটা কিন্তু বিশাল বড়। এখনও তাদের যৌথ পারিবার। সামনে ফুলের বাগান, বাগানের মাঝখানে একটা ফোয়ারা, বাগানের তিন দিক ঘিরে দোতলা বাড়ি। সামনে পিছনে টানা চওড়া বারন্দা আছে। বাড়ির পেছন দিকেই গঙ্গা। আগে বাড়ি থেকে গঙ্গায় নামবার সিঁড়ি ছিল। এখন সিঁড়ি ভেঙে গেছে। পিছন দিকে ফলের বাগান। আর পাম গাছের সারি। আছে একটা বজরা বাধা থাকত। আগে। সে বজরা কবে ভেঙে গেছে। যশোধরর বজরা দেখেনি। তবে এ তাদের আসল বাড়ি নয়। পূর্ব বঙ্গের জমিদাররা কলকাতায় একটা করে বাড়ি করে রাখতেন, কালেভদ্রে এল থাকবার জন্য। এ হল সেই বাড়ি। তাদের আসল বাড়ি ছিল ময়মনসিংহে। যশোধরা শিশুকাল থেকে সেই বাড়ির গল্প শুনে শুনে বড় হয়েছে। সেইসব গল্পের মধ্যে অবশ্য অনেক দীর্ঘশ্বাস মেশা আছে। কিন্তু যশোধরার কোনও দুঃখ নেই। এ বাড়িতেই সে জন্মেছে, এই বাড়িই তার ভাল লাগে। এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে খুব খারাপ লাগবে।

আজকের দিনটা অন্য দিনের মতো নয়। আজ অন্যরকম একটা দিন। মনের মধ্যে বিদ্রোহটা আছে ঠিকই, উত্তেজনা আছে, বুক কাঁপা আছে, আবার মাঝে মাঝে শিউরেও উঠছে গা। দাঁতে ব্রাশ নিয়ে পিছনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে রইল একটু যশোধরা। বারান্দায় অনেক পাখির খাঁচা। এখন আর সব কটাতে পাখি নেই। মোট তিনটে খাঁচা আর দুটো দাঁড়ে পাখি আছে। দাঁড়ে বুড়ো একটা কাকাতুয়া, আর একটা টিয়া। খাঁচায় ময়না, বুলবুলি আর চন্দনা। ভোরের আলো দেখে পাখিরা কিছু চঞ্চল এবং মুখর। খাঁচা খুলে, শিকলি কেটে আজ কেন পাখিদের উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছে তার?

গঙ্গার উদাস হাওয়া এসে বিলি কেটে যায় চুলে। রোজকার বাতাস, তবু মনে হয় আজ যেন বিদেশী বাতাস! দাঁতে ব্রাশ চালাতে ইচ্ছে করে না আজ। আজ শুধু ভোরের দিকে চেয়ে ইচ্ছে করে।

কিন্তু বাড়িতে আজ সাজো-সাজো রব। ও ঘরে জ্যাঠাইমা আর পিসিমা,পিসতুতো বোন,জ্যাঠাতুতো বোনেরা ঘুম থেকে উঠে পড়ে হুড়োহুড়ি লাগিয়েছে। গ্যারাজ থেকে তাদের বহু পুরোনো অস্টিন অফ ইংল্যান্ডখানা বের করা হয়েছে সামনের রাস্তায়, সেটাকে স্টার্ট দিয়ে পরীক্ষা করছে বুড়ো ড্রাইবার মাইমদা। তারা সবাই মিলে দক্ষিণেশ্বর যাবে পূজো দিতে। আজ শুভ দিন, মেয়ে যাতে সসম্মানে আজকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তার জন্যেই পূজো দিতে যাওয়া।

মুখ-টুখ ধুয়ে এসে সাজতে সাজতে যশোধরা বলল, মা, আমরা তো নৌকাতেও যেতে পারতুম! কাছেও হত।

নৌকো! দূর পাগলী, নৌকো করে আবার আমরা কবে যাই! সেই আগের আমলে নৌকো করে যাওয়া হত। আমার ভয় ভয় করত বাবা।

নৌকোয় যাওয়া কত থ্রিলিং বলো তো!

এতগুলো লোক শেষে নৌকো উল্টে জলে পড়ি আর কি। একটা শুভ কাজে যাচ্ছি।

শুভকাজে গঙ্গা ছুঁয়ে যাওয়া কি ভাল নয় মা! তোমাদের কোনও ইমাজিনেশন নেই।

তোর মাথায় সব কিম্ভূত আইডিয়া খেলে।

না মা, আমার মাথায় প্র্যাকটিক্যাল আইটিই খেলে। পেট্রল না পুড়িয়ে নৌকোয় গেলে তাড়াতাড়ি হত, পণ্য সঞ্চয় করতে পারতে। একটা পরিব মাঝি কিছু রোজগার করত এবং যাওয়াটা হত দারুণ সুন্দর।

সনয়নী আর কথা খুঁজে পেলেন না।

শুধু বললেন, ওরে, তাড়াতড়ি কর।

লালপেড়ে গরদের শড়িতে যশোধরার রূপ আজ যেন ফেটে পড়ছে। অঢেল চুল চালচিত্রের মতো খোলা রয়েছে পিছনে। কপালে মস্ত লাল টিপ। মুখে রূপটান নেই। মেয়ের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছেন না সুনয়নী। তিনি নিজে কম সুশ্রী ছিলেন না। যশোধরা তার চেয়েও সুন্দরী। তাঁর চেহারায় উগ্রতা ছিল। যশোধরা স্নিগ্ধ।

চুলগুলো আর একবার পাট করতে করতে যশোধরা আনমনে বলে, আমি তো তোমার একটা মাত্র মেয়ে মা। একটাই সন্তান।

তাই তো!

তবু সেই আমাকেই বিদেয় করার জন্যে তোমার এত ব্যস্ততা কেন?

সুনয়নী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলন, ব্যস্ততার কী দেখলি! তোর বাইশ বছ বয়স হল না? আর দেরী করলে নিন্দে হবে। এ বংশে এত দেরীতে বিয়ে হয় নাকি? আমি তো এলুম ষোলোয়। নিদি এসেছে তেরোয়। সতেরো না পুরুতেই ভাসুরঠাকুর তার দুই মেয়ের বিয়ে দিলেন। আমরা তো অনেক দেরী করে ফেলেছি সে তুলনায়।

তুমি এখনও অনেক পিছেয়ে আছ মা। অনেক।

আর বেশী এগোতে পারব না বাবা। সবাই এগিয়ে গিয়ে যা খেলা দেখাচ্ছে!

পাত্রটি সম্পর্কেও তোমরা কিন্তু তেমন কিছু জানো না মা।

কী জানব?

মদ বা সিগারেট খায় কিনা, চরিত্র কেমন, কোনও ক্রনিক অসুখ আছে কিনা।

ওরে বাবা, সেসব খোঁজ না নিয়েই বিয়ে দেবো নাকি?

মেয়ে দেখানোর আগেই কিন্তু খোঁজ নেওয়াটা উচিত ছিল।

খোঁজ নেওয়া হয়েছে রে বাবা। ছেলে খুব ভাল। সবচেয়ে বড় কথা, বড় বংশের ছেলে তো, খুব বেশী খারাপ হয় না। সঙ্গ দোষে যদি একটু খারাপ হয়ও, ঠিক শুধরে যায়।

ওঃ, বংশ বংশ করেই তোমরা গেলে। বড় বংশে কি দোষ কিছু কম ছিল?

তোর সঙ্গে পারি না আমি। আয়, আমর কাছে আয় কটকটি, তোকে একটু আদর করি।

এই একটা ব্যাপারে যশোধরার কখনও আপত্তি নেই। সে অফুরন্ত আদর খেতে পারে। সুনয়নী বলা মাত্র সে মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একটু জড়াজড়ি করে থাকার পর মেয়ের বাঁ হাতটা তুলে কড়ে আঙুলে একটু কামড় দিলেন সুনয়নী। থুঃ থুঃ করে একটু থুতু ছিটানোর ভান করলেন। তারপর মেয়ের মুখখানা দুহাতে তুলে ধরে চোখের দিকে চেয়ে বললেন, খারপ কিছু কি হতে পারে? ঠাকুরকে কত ডাকছি। কিছু খারাপ হবে না মা।

যশোধরার সঙ্গে তার বাবার এত ঘনিষ্ঠতা নেই। জয়নাথ রাশভারী মানুষ। অসম্ভব ব্যক্তিত্ববান বুদ্ধিমানও বটে। জ্যাঠামশাই একটু শৌখিন আর ভাবালু মানুষ। দেশভাগের পর জয়নাথ হাল না ধরলে দুর্দশায় পড়তে হত তাঁদের। জয়নাথ এদেশে এসেই জমিদারি চাল ছেড়ে ব্যবসাতে নেমে পড়েন। এই কঠোর বাবার সঙ্গে যশোধরার একরকম দেখাসাক্ষাৎই হয় না। তবু যশোধরা কেমন করে যেন টের পায়, দুনিয়াতে মায়ের চেয়েও বোধহয় ওই লোকটি তাকে বেশী ভালবাসে। কি করে টের পায় সেটাই এক রহস্য। আদিখ্যেতা কিছু নেই বাবার। কিন্তু গভীর এক চোখ আছে। আর আছে গভীর ভালোবাসা থেকে জন্মানো এক অদ্ভুত অনুমানশক্তি। যশোধরার সব রকম অসুখ-বিসুখ বা ছোটোখাটো ব্যাথা-বেদনায় বাবা ঠিক বাতাসে খবর পেয়ে চলে আসে কাছে। জ্বরতপ্ত মাথায় বাবা হাতখানা রাখলেই যেন শরীর জুড়িয়ে যায়।

ব্যাবসার কাজে জয়নাথ নানা জাগায় ঘুরে বেড়ান। যশোধরা আর কতটাই বা কাছে পায় বাবাকে? তবু বিয়ে হয়ে গেলে বুঝি বাবার জন্যই তার সবচেয়ে বেশ কষ্ট হবে। সেই কষ্টটার নম্বর যদি দশা হয়, মাকে ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট তবে সারে নয়। তার জ্যাঠা আছে, জ্যাঠাইমা আছে, অন্য সব তুতো বোন আর ভইয়েরা আছে, পোষা পাখি, পোষা কুকুরে, তিনটে বেড়াল, এমন কি ওই কুঠিঘাটের গঙ্গা, এখনকার আলো-বাতাস, ফুলের বাগান, আর এই যে তাদের মায়ের মতো মিষ্টি বাড়িটা, কার জন্য কষ্ট কম? নম্বর দিয়ে দেখছে যশোধরা, অনেক হয়। অনেক। তার বদলে কী পাবে যশোধারা কে জানে!

সকালটা বেশ কাটল। গাড়ি করে সবাই হৈ- হৈ করতে করতে দক্ষিণেশ্বর যাওয়া; দক্ষিণেশ্বর মন্দির তাদের অচেনা জায়গা নয়। কোনও শুভ কাজ ঘটবার আগে এখানে পুজো দিতে আসবেই; চেনা লোক আছে, ভিড় থাকলেও তাদের ঠিক আগে ঢুকিয়ে দেয়।

আজ যশোধরার প্রণাম অন্য দিনের মতো হল না। দুরুদুরু বুকে অনেকক্ষণ মাথা পেতে রাখল মন্দিরের শানে। যেন নিবেদন করে দিল নিজেকে। ভাল মন্দ সে কিছুই জানে না। আর কেউ তার ভাল মন্দের ভার-নিক।

শ্বশুরবাড়িকে আজকাল সব মেয়েই ভয় পায়। কত মেয়ে মরছে, খুন হচ্ছে। আজ স্বামী, শাশুড়ি, দেওর, শ্বশুর ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। কী বিচ্ছিরি সব কাণ্ড যে হচ্ছে!

দুপুরে কোনওদিন ঘুমোয় না যশোধরা। আজ খেয়ে দেয়ে উঠতেই মা বলল, একটু শুয়ে থাক। মুখচোখ বড্ড শুকনো দেখাচ্ছে।

যশোধরা ঝংকার দিল, ইস, ওদের জন্যে সুন্দরী হতে হবে বুঝি! অত লাগে না।

আচ্ছা আয়, দুজনে শুয়ে শুয়ে গল্প করি।

না তো, আমি জ্যাঠাইমার ঘরে একটা পান খেয়ে ইতি-মিতিদের সঙ্গে ছাদের ঘরে গিয়ে আড্ডা দেবো।

পান! উঁহু বাবা, আজ পান খেয়ে কাজ নেই। দাঁতগুলো লাল দেখাবে।

দেখাক গে। অত পাত্তা দিও না তো মা। তোমাদের সম্মান রাখতে সামনে গিয়ে বসব সেটাই ঢের।

সুনয়নী মেয়ের সঙ্গে কোনওদিনই এঁটে ওঠেন না। শাসন করার ধাত তাঁর নেই, তারওপর বড্ড আদরের মেয়ে। এত আশকারা পেয়েছে যে, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে ওর বড় কষ্ট হবে। সুনয়নী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আজকাল লেটার বক্সে পাড়ার বদমাস ছেলেরা যশোধরার নামে নানারকম প্রস্তাব তুলে চিঠি দিয়ে যায়। ওর কলেজের একজন অধ্যাপক আর একজন অধ্যাপককে যশোধরাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠিয়েছিল জয়নাথের কাছে। একজন সিনেমার লোক যশোধরাকে সিনেমায় নামানোর কথা বলতে এসেছিল। এ ছাড়া রাস্তায় বেরোলো পেছনে লাগা তো আছেই। ওই আগুন রূপ কি আর পোকামাকড়দের টানবে না! তবে যশোধরা ভাল মেয়ে। একটু বোধ হয় অহংকারীও। কাউকে পাত্তা দেয়নি।

সুনয়নী হাতে ঘড়ি বেঁধে একটু শুলেন। ঘুম হবে না। পাঁচটা ওরা এস পড়বে। পাত্র নিজে আসবে না। পাত্র কেন আসবে না সেটাই ভাবছেন সুনয়নী। মা বোনেরা যাকে পছন্দ করে দেবে তাকেই বিয়ে করবে এমন পাত্র কি আজকাল আছে নাকি? বিশেষ করে যে পাত্র আমেরিকায় থাকে!

ভাসুরঠাকুর অবশ্য বারবার বলেছেন, পাত্র ওল্ড ভ্যালুজে বিশ্বাসী বলেই মেয়ে দেখতে চাইছে না। আরে নেই-নেই করে এখনও ভ্যালুজ বলেই কিছু আছে।

তাই হবে। তবু একমাত্র সন্তানের ভাবনায় মায়ের মন নানা কথা ভেবে যায়।

চারটের সময় সাজানো শুরু হল যশোধরাকে। সুনয়নী আর তাঁর জা দুজনে মিলে একটা বালুচরি শাড়ি পছন্দ করে রেখেছেন। নীলচে রঙে ময়ূরকণ্ঠী জমি। তাতে কলকা বুটি। আর আঁচলে রামায়ণের ডেপিকশন্স, নানা রঙের সুতোয় কাজ করা।

দেখেই ছুলে ওঠে যশোধরা, ও শাড়ি কেন পরবো? ঘরোয়া শাড়ি বের করো। অফ হোয়াইট বা ক্রিম রঙের।

জ্যাঠইমা সুচেতা আর সুনয়নী দুজনেই ঝোলাঝুলি করে হাল ছাড়লেন। সুচেতা হতাশ গলায় বললেন, দে, মুখপুড়িকে সাদা বেনারসীটই বের করে দে। এই ভূতটাকে তো সবই মানায়।

আদরের বকা। তবু ফোঁস করে ওঠে যশোধরা, ওসব চালাকি ছাড়ো তো বড়মা। কায়দা করে বেসারসী পরাবে তা হবে না।

তাহলে ট্যানা পরে সামনে যাস। ওরে অত হ্যাক ছি করতে নেই। তারাও ফ্যালনা নয়।

তা হোক, তবু কাউকে খুশি করতে আমি এই দিনদুপুরে অত ঝকমকে সাজ করতে পারবো না। তোমরা সরো তো, ও ঘরে যাও দুজনে। গিয়ে আমার মুণ্ডুপাত করো। আমি আমার পছন্দমতো সেজে নিচ্ছি।

সুচেতা সুনয়নীর দিকে চেয়ে করুণ গলায় বললেন, তাই করো। চল ও-ঘরে গিয়ে বসি। নিজেই সেজে আসুক। কথাটা হয়তো মিথ্যেও বলেনি। আমাদের একটু সেকেলে নজর।

পরাজিত দুই মহিলা পাশের ঘরে গেলেন। যশোধরা কিছুক্ষণ আলমারি খুলে তার অজস্র হ্যাঙ্গারে ঝোলানো শাড়ির দিকে চেয়ে রইল। পুজোয়, জন্মদিনে, ষষ্ঠীতে, নববর্ষে জ্যাঠা দেয় জেঠিমা দেয়, বাবা দেয়, আবার মাও দেয়। পছন্দ হলে সে নিজেও দোকান থেকে কিনে আনে। কত জমেছে তার শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, চুড়িদার, রাজস্থানী পোশাক, মেক্সোহেবী পোশাক। আজ অবশ্য শাড়ির দিন। বেছেগুছে সে একটা তাঁতের শাড়ি বের করল। সরু সবুজ পাড়, জমিটা মাজা বাসন্তী

রঙের। খুব উজ্জ্বল নয়। মুখে প্রসাধন ছোঁয়াল না, শুধু টার্কিস তোয়ালে দিয়ে মুছে নিল। চুল এলোই রইল।

এসো, দেখে যাও পছন্দ হয়েছে কিনা।

সুনয়নী আর সুচেতা ঘরের দরজায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালেন। সাজেনি, তবু কী অপরূপ দেখাচ্ছে!

সুনয়নী গম্ভীর হয়ে বললেন, কুঁচিটা ঠিক করে নে।

যা খাইয়েছো দুপুরে, নিচু হতে পারছি না।

সুচেতা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন, আমিই দিচ্ছি ঠিক করে।

সব ঠিকঠাক হলে একটা শ্বাস ফেলে যশোধরা বললেন, নাও, এবার আমি যুদ্ধের জন্য তৈরি।

আহা, যুদ্ধ! যুদ্ধ কিসের রে? ওরা কি তোর শত্রু?

পাত্রপক্ষ মানেই আজকাল মেয়েদের শত্রু।

খুব পণ্ডিত হয়েছো!

ইতি আর মিতিকে ডেকে দেবে বড়মা? ময়ার্ন সাজ তো তোমরা বোঝো না। ওরা বুঝবে।

দিচ্ছি ডেকে বাবা। তবে বলি যা সেজেছো তাতেই হবে। তোমার তো সাজ লাগে না। কিন্তু বলি, গুরুজনের কথা অমান্যি করার অভ্যাসও ভাল নয়। শ্বশুর বাড়ি গেলে বুঝবে।

ইস, গুরুজন! ওরা আবার গুরুজন নাকি! তোমরাই আমার গুরুজন। তোমাদের তো অন্য সময়ে অমান্য করি না।

সুনয়নী মৃদু স্বরে বলেন, তা করো না। কিন্তু এখনই বা করলে কেন? আজকাল খুব উইমেনস্ লিব করতে শিখেছো, না?

যুগের ধর্ম মা, কী করে ঠেকাবে? কনেবউ সাজা আমাদের পোষাবে না।

সুচেতা সুনয়নীর দিকে চেয়ে বললেন, আর ঘাঁটাসনি, যা হয়েছে তাই হয়েছে। ও সাজলেও পছন্দ করবে, না সাজলেও করবে।

সুনয়নী মৃদু স্বরে বলেন, অত সোজা নয় দিদি। পাত্রপক্ষ যদি বুঝতে পারে, ইচ্ছে করেই সাজেনি, তাদের পাত্তা দিতে চাইছে না বলে,তখন তো আর রূপটাই বিচার করবে না, স্বভাবটাও দেখবে।

থাকগে, যেতে দে। সাজেনি বলে তো আর মনে হচ্ছে না।

প্রসঙ্গটা এখানেই শেষ হল।

অভয়নাথ আর জয়নাথ ধুতি পাঞ্জাবি পরে বাইরের ঘরে বসে ছিলেন। সাবেক বৈঠকখানায় এখনও কয়েকখানা তৈলচিত্র। সবই পূর্বপুরুষদের পোর্ট্রেট, সোফা আছে, আবার পুরনো আমলের নিচু বৈঠকখানাও বিদেয় হয়নি। তাকিয়ার বন্দোবস্ত আজও আছে। অভয়নাথ গান-বাজনার লোক। মাঝে মাঝে এ-ঘরে জলসা হয়।

অভয়নাথ ঘড়ি দেখে বললেন, অলকের একটা পাল্টা টেলিফোন আসা উচিত ছিল এতদিনে।

জয়নাথ মৃদু স্বরে বললেন, আসবে। সে ইররেসপনসিবল্ ছেলে নয়।

ইররেসপনসিবল্ না হলেও একটু ঢিলে স্বভাবের আছে। ওর খবরটা পাওয়ার আগে পাত্রপক্ষকে মেয়ে দেখানোটা আমার ইচ্ছে ছিল না। দেরী করছে এদিকে পাত্রপক্ষেরও তাড়া। এত তাড়াহুড়োই বা কেন বুঝি না।

জয়নাথ গভীর চিন্তামগ্ন। এ কথার জবাব দিলেন না।

অভয়নাথ বললেন, অবনীবাবুকে অবশ্য চিনি। সামান্যই পরিচয়। লোকটি চমৎকার। এখন ছেলে ভাল হলেই ভাল।

জয়নাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, কিছুই আমাদের হাতে নয় দাদা। উই টেক ডিসিশানস্ অন হোপ অ্যান্ড ডিজায়ার।

সেটা ঠিক। কিন্তু ছেলেটাকে দেখলি কেমন?

খরাপ নয়। তবে ওই একঝলক দেখা। কোথায় যেন বেরিয়ে যাচ্ছিল, ওর মা ডেকে পরিচয় করিয়ে দিল। মিনিট দুয়েকের দেখা।

পা ছুঁয়ে প্রণাম করল?

না। হাতজোড় করে। অভ্যেস নেই বোধহয়।

অভ্যেস ওর না থাকতেই পারে। কিন্তু ওর মা তো ছিল, সে কেন বলল না পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে? তার মানে সহবত জানে না।

আজকালকার ছেলে।

সবাই তোরাও কথা বললে কেমন করে হয়? আজকাল বলতেই কি বিভীষিকা, অরাজকতা, ঔদ্ধত্য?

জয়নাথ মৃদু হাসলেন, দাদা, বিয়ে তো এখনও ঠিক হয়নি। কাটিয়ে দেওয়ার অনেক সময় আছে, পছন্দ না হলে।

কিন্তু দেখে ফেলেছে যে! খামোখা মেয়েকে এক্সপোজ করব কেন যদি সম্ভাবনা না থাকে?

বলেছি তো, ইচ্ছে না থাকলেও ভদ্রহিলার চাপাচাপিতে রাজি হতে হল।

এত চাপাচাপি কিসের?

ছেলে আমিরিকায় থাকে, সেখানে কি হয় না হয়। কতরকম ভয়ভীতি থাকে মানুষের।

তার মানে ছেলের ওপর কনফিডেন্স নেই। এটাও ভাল লক্ষণ নয়। যে ছেলেকে তার মা বিশ্বাস করে না তাকে আমরা বিশ্বাস করি কিভাবে?

মায়ের মন একটা আলাদা ব্যাপার। অকারণ আশঙ্কা মায়েদের স্বভাবগত।

বউমা বলেছিলেন ছেলে যে নিজে মেয়ে দেখতে আসছে না এটা তাঁর ভাল লাগছে না।

হ্যাঁ, আমাকেও বলেছেন।

সেটা নিয়ে ভেবেছিস?

না, ভেবে কী হবে? তাঁরা জাস্ট মেয়েটাকে একটু দেখতে চান। আমরা দেখাচ্ছি।

উই শুড লুক বিফোর উই লিপ।

হ্যাঁ, সে তো বটেই।

বাইরে গাড়ির একটা হর্ন শোনা গেল। দু'ভাই যুগপৎ বেরিয়ে দেখলেন, পাত্রপক্ষ এসে গেছে। চারজন আসার কথা ছিল। কিন্তু গাড়ি থেকে নামল পাঁচজন।

জয়নাথ চাপা গলায় বললেন, ছেলেও এসেছে দেখছি।

কোনজন?

ওই সবার পিছনে।

পাত্র এসেছে এ খবরটা ভিতর বাড়িতে রটে যেতে দেরী হল না। সামান্য একটু হুড়োহুড়ি আর উঁকিঝুঁকি পড়ে গেল দোতালার বারান্দায়, অলিন্দে।

এ বাড়িতে এখনও নহবৎখানা আছে, দেউড়ি এবং দারোয়ান আছে, মালী আছে, ফর্সা ধুতি বা পায়জামা পরা এবং কাচা গেঞ্জি গায়ে তিনচারজন চাকর আছে, ছ'ফুট লম্বা দেয়ালঘড়ি আছে, বাগানে শ্বেতপাথরের ফোয়ারা আছে দেখে ঈষৎ বিস্মিত পাত্রপক্ষ দোতালায় উঠে এল। দুজন পুরুষ তিনজন মহিলা।

হলঘরে সাবেক আমলের আবলুস কাঠের মস্ত খাওয়ার টেবিল, তাকে ঘিরে মানানসই ভারী এবং অনড় চেয়ার। বসলে মচাৎ করে শব্দ হয় না। গদিগুলোও আরামদায়ক ভাবে নরম। মোটা দেয়াল এবং চুন সুড়কির গাঁথুনি, দরজায় জানালায় খস লাগানোর নীট ফল, ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। এয়ার কন্ডিশনের মতোই। বাতাসে রুম ফ্রেশনার ছড়ানো রয়েছে। মৃদু সুবাস।

টেবিল ঘিরে পাত্রপক্ষ বসলেন। চারজনের জায়গায় পাঁচজন আসায় চেয়ার কম পড়ে না। অভয়নাথ ও জয়নাথএকটু দূরে মুখোমুখি বসলেন। কিছু বেমানান দেখাল না।

জ্যোৎস্না সামান্য কুণ্ঠিত গলায় জয়নাথের দিকে চেয়ে বললেন, ওকেও নিয়ে এলাম। রওনা হওয়ার মুখে মুখে ধনবাদ থেকে ফিরল। জোর করেই এনেছি। গাড়ির জামাকাপড় অবধি ছাড়তে দিইনি।

অভয়নাথের মুখ চোখ দুই-ই গম্ভীর। পাত্রের এই হঠাৎ-আসাটাও তিনি ভাল চোখ দেখছেন না।

জ্যোৎস্নাই বললেন, ভেবে দেখলাম, আপনারা বিশিষ্ট ভদ্রলোক, আপনাদের বারবার বিরক্ত করা ঠিক হবে না। আমরা পছন্দ করে যাওয়ার পরও যদি ছেলে হঠাৎ নিজে মেয়ে দেখার বায়না করে। তার চেয়ে একবারেই দেখে নেওয়া ভাল।

সে তো বটেই।

কথার মাঝখানে চাকর সরবত নিয়ে এল। সঙ্গে ঘরে কাটা ছানার সন্দেশ।

আগে মেয়ে দেখি।

না, আগে মিষ্টিমুখ। অভয়নাথের গম্ভীর ঘোষণা।

এ-বাড়ির আবহাওয়াটাই কিছু গম্ভীর ঠেকল পাত্রপক্ষের কাছে। একটা পুরনো সাবেক কালের গেরামভারী বাতাস যেন থমকে থেমে আছে। সিলিঙ পাখা তাকে নাড়াতে পারছে না। গঙ্গার হাওয়া তাকে তাড়াতে পাছে না।

পাত্রপক্ষ অগত্যা সরবতে চুমুক দিল এবং সন্দেশ কামড়াল।

ভিতরের ঘরে সুনয়নী মেয়েকে বললেন, আয় মা, ওঁরা অপেক্ষা করছেন।

না মা, ওরা কথা বলছেন। ওঁদের কথা শেষ হোক, তারপর যাবো।

ও মা! কথা বলছেন তো কী হয়েছে!

কথার মাঝখানে আমি যাবো কেন? ওঁরা কথা থামাক, তৈরি হোক, অপেক্ষা করুক। তবে যাবো। সব ব্যাপারেই একটা মোমেন্ট আছে মা, যেমন-তেমনভাবে কিছু করতে নেই।

কোথায় যাবো বাবা! গুয়ের গ্যাংলা মেয়ে আমাকে কত কিছু শেখাচ্ছে!

আমি অত সস্তা হতে পারি না মা। আর আমার তো তাড়া নেই!

ওদের তো থাকতে পারে।

অত তাড়া নিয়ে আসে কেন? যাও, ওদের চুপটি করে বসতে বলো। আর খাওয়া শেষ করুক। সন্দেশ চিবোতে চিবোতে আর সরবতে চুমুক দিতে দিতে হেলাফেলা করে তাকাবে ও চলবে না।

বাবা রে বাবা! এত বায়নাক্কা থাকলে জীবনে সুখী হওয়া শক্ত হবে মা।

মাথাটার মধ্যে তোর কী সব খেলছে সবসময়ে বুঝতেই পারি না।

সুনয়নী গজগজ করলেন বটে, কিন্তু আর ঘাঁটালিন না। চাকর হরিশঙ্করকে ডেকে বললেন, নজর রাখিস, পাত্রপক্ষের খাওয়া শেষ হলে আমাকে খবর দিবি।

জানালার ধারে একটা মোড়ায় বসে গঙ্গার দিকে চেয়ে রইল যশোধরা। তার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। বুক শুকিয়ে উঠছে। এ বাড়ি থেকে বিদায়ের বাজনা বাজছে। সব মেয়েকেই পরের ঘরে যেতে হয়। সেজন্য সে কি ছেলেবেলা থেকে মনে মনে তৈরি নয়? তৈরিই, তবু ঘটনাটা যখন ঘটতে শুরু করে তখনই একটা উল্টো টান যেন বড় বেশী টের পাওয়া যায়।

হরিশঙ্কর এসে খবর দিল, খাওয়া শেষ হয়েছে মা।

সুনয়নী মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, আমি ওদের চুপ করিয়ে দিতে যাচ্ছি।

দয়া করে আমার পিছু পিছু এসো কিন্তু।

সুনয়নী হলঘরে ঢুকে পাত্রপক্ষের উদ্দেশে হাতজোড় করে বললেন, আমার মেয়ে আসছে।

চুপ করানোর পক্ষে এই ঘোষণাই যথেষ্ট। পাত্রপক্ষ স্থির হয়ে দরজার দিকে চেয়ে রইল।

যশোধরা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে মুহূর্তটিকে রচনা করে নিল। যেন নাটকের কোনও ভূমিকায় বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তে সে প্রবেশ করেছে। অমনোনীত হওয়ার ভয় তার নেই। কিন্তু সবকিছুই ঘটাতে চায় তার নিজের মতো করে।

যশোধরা পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই পাত্রপক্ষ চুপ থেকে নিথর হয়ে গেল। ঘরের আবহাওয়ায় যেন সঞ্চারিত হল একটা মৃদু আলো।

এই মুগ্ধতা নিজের সর্বাঙ্গে অনুভব করে যশোধরা। আর এজন্যই সে মুহূর্তটিকে রচনা করতে চেয়েছিল। শেষ অবধি অবশ্য সেই ক্রীতদাসী হওয়াই হয়তো সব বিয়ের পরিণতি। দুনিয়ার মেয়েরাই সবচেয়ে সস্তা পণ্য সস্তার ঝি, সস্তার রাঁধুনী সস্তার সেবদিবাসী। যশোধরা সেই ঐতিহ্যকে ভেঙে ফেলার শক্তি রাখেনা এখনও। কিন্তু তবু তার সাধ্যমতো সে নিজেকে অপমানিত হতে দিতে চায়না। যত সূক্ষ্মই হোক।

হ্যাঁ, তার কপাল অবশ্যই কষ্ট আছে। সে জানে।

আর কেই নয়, সবার প্রথমেই সে দেখতে পেলতোতনকে। প্রথম নজরেই। জিনসের প্যান্ট আর সাদা ফতুয়া পরা। দেখতে আহামরি কিছু নয়। খুব বেশী সুন্দর পুরুষকে ভালও লাগে না যশোধরার। এ ছেলেটা সেরকম সুন্দর নয়। চোখ দেখলেই বোঝা যায়, এ অন্যমনস্ক, ভুলো স্বভাবের লোক। প্রাকটিক্যাল নয়। এর ওপর প্রভাব বিস্তার করা সহজ। আর ওখানেই মুশকিল। তোতন একবার তাকিয়েই নববধূর মতো চোখ নত করে ফেলেছে। অস্বস্তি বোধ করছে সে। শুধু তিনজোড়া মেয়ে চোখ পলকহীন এবং স্থির হয়ে আছে তার ওপর।

সম্মোহন সম্পূর্ণ। মুহূর্তটি রচিত হয়েছে। যশোধরা কিছুক্ষণ স্থির প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে থেকে সম্মোহনটা ভেঙে দিল। হাতজোড় করে একটা নমস্কার করল সে। তারপর দেয়ালের কাছে ঘেঁষে রাখা নির্দিষ্ট চেয়ারে বসল।

পাত্রপক্ষ এতক্ষণ যাদু হয়ে থাকার পর এখন একযোগে স্বস্তির শ্বাস ফেলল।

সে কতোখানি এদের ইমপ্রেস করেছে তা জ্যোৎস্নার প্রায় রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল, আমার কি এমন ভাগ্য হবে যে, এক বউ করে ঘরে নিয়ে যেতে পারব! এ যে লক্ষ্মীপ্রতিমা!

জয়নাথের দিকে অভয়নাথ এমনভাবে তাকালেন যার অর্থ হয়, কেমন বুঝছো? জয়নাথ বিস্মিত হলেন না, কারণ এরকমই তো হওয়ার কথা।

সুনয়নীর বুকখানা ভরে উঠল মায়ায়। তার দিকে চেয়েই জ্যোৎস্না বললেন, আপনিও ভিষণ সুন্দরী, কিন্তু মেয়ে বুঝি আপনাকেও ছাড়িয়ে গেছে!

এই বলে খুশিতে ফেটে-পড়া চোখে নিজের মেয়েদের দিকে তাকালেন জ্যোৎস্না।

কোনও সুন্দরী আছে যাকে দেখলে বুকে জ্বলুনি হয়। কোনও সুন্দরীকে দেখলে রাগ হতে থাকে। কোনও সুন্দরীকে দেখলে আদর করতে ইচ্ছে যায়। এরকম নানারকম প্রতিক্রিয়া আছে মেয়েদের। যশোধারাকে দেখে মিস্টি আর বান্টির একটু অন্যরকম হল। বান্টি ফিসফিস করে মিস্টিকে বলল, এ যেন আমাদের বাড়িতে ঠিক মানাবে না। কোটিপতির ঘরে হলে মানাতো।

আহা, থাকবে তো আমেরিকায় বাবা, বেমানান হবে কেন? দারুন, না?

উঃ,কতটা লম্বা দেখছিস! পাঁচ তিন হবে।

রং কী!

জ্যোৎস্না সবই শুনতে পেলেন। খুশিতে ডগমগ করছে তার বুক। তোতনের দিকে তাকিয়ে ফের ভাবী বেয়ানের দিকে চেয়ে বললেন, এই তো আমার ন্যালাক্ষ্যাপা ছেলে। বড্ড উদাসীন। তবে ছাত্র খুব ভাল ছিল। মাসে ছয় হাজার ডলার মাইনে পায়। যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে তবে বিয়ের দিন দিখতে পারেন। আমাদের খুব পছন্দ হয়ে গেছে।

বান্টি চাপা স্বরে বলে, একটু দেমাক আছে কিন্তু।

মিস্টি বলে, থাকতেই পারে বাবা, অমন রূপ হলে হলে আমারও মাটিতে পা পড়ত না। নাকটা আর একটু টিকালো হলে–

যাঃ! নাকটাই তো সুন্দর। কী পাতলা! অনেক চুল রে!

ভগবান একেবারে ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু একদম সাজতে জানে না দেখেছিস! কী একখানা ম্যাড়ম্যাড়ে শাড়ি পরেছে!

ইচ্ছে করেই সাজেনি বোধহয়। পাছে আমাদের মাথা আরও ঘুরে যায়! কপালটা কিন্তু একটু উঁচু।

কিছু বেমানান লাগছে না। রংটা একটু বেশী সাদাটে।

মেমসাহেবদের দেশে মানিয়ে যাবে।

নোটন বুঝতে পারছে না তার ভূমিকাটা কী হবে। বাবা চারিদিকে লক্ষ রাখতে বলেছেন। কিন্তু লক্ষ করেও সে কিছু ধরতে পারছে না। শুধু বুঝতে পারছে, পাত্রী দারুণ রকমের সুন্দরী এবং এরা একটু গম্ভীর ও কম কথার মানুষ।

নোটনের ভূমিকাটা বড্ড গৌণ হয়ে যাচ্ছে। কেউ কোনও কথা বলছে না তার সঙ্গে। তাকাচ্ছেও না কেউ। আর নোটন নিজেও কিছু বুঝে বা আঁচ করে উঠতে পারছে না। তাই সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, মেয়ে কি গান জানে?

জয়নাথ মৃদু হেসে বললেন, ওকেই জিজ্ঞেস করুন না।

নোটনের ভারী লজ্জা করল। বলল, না না, ঠিক আছে। দেখে মনে হয় জানে।

সবাই সামান্য হাসল। এমন কি যশোধরাও। দেখে নাকি বোঝা যায় যে গান জানে।

সুনয়নী বললেন, জানে। তবে গানের পিছনে বেশী সময় দিতে পারেনি। বরাবর পড়াশুনার ঝোঁক। রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালই পারে।

কেউ অবশ্য গান শুনতে চাইল না।

জয়নাথ নোটনের দিকে চেয়ে বলে আপনি তো শুনেছি খুব পরোপকার করেন।

নোটন, লাল হল, না, না।

জ্যোৎস্না তার পাগল ছেলেটির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, খেলা আর পরের কাজ নিয়েই আছে। দুনিয়ার আর কিছুই চায় না ও। এই ছেলের জন্য চিন্তা করে করেই হয়তো আমার আয়ুক্ষয় হবে। আজ সকালেই তো বস্তির লোকের মড়া পুড়িয়ে এল। আবার তার নাতিটিকেও ঘরে এনে তুলেছে। আমার যে কী জ্বালাতন!

নোটনের দিকে এখন সকলের চোখ। নোটন একটু হাঁসফাঁস করে বলে, উপকার-টুপকার নয়। আসলে ওইসব লোকের জন্য একবার কিছু করলেই ওরা এমন পেয়ে বসে।

জ্যোৎস্না বললেন, আগে পলিটিকসও করত। মার খেয়েছে, জেলে গেছে। শেষে বকে বকে ছাড়িয়েছি। আমার বড় ছেলেই যা একটু প্র্যাকটিক্যাল, এরা দুজন নয়। ছোটোটি আরও। আমেরিকায় গিয়ে তিন মাস ছিলুম ওর কাছে। কী অগোছালো থাকে বলার নয়।

কথার মাঝখানে হঠাৎ বান্টি বলল, আচ্ছা আমরা কিন্তু এখনও যশোধরার গলার স্বরটাও শুনিনি। তুমি কিছু বলবে না আমাদের?

যশোধরা খুব নিবিষ্ট চোখে নোটনের দিকে চেয়ে ছিল। লম্বা, ফর্সা, মজবুত গড়নের এই মানুষটিকে এই প্রথম লক্ষ করেই তার ভাল লেগে গেল। যারা পরোপকার করে তাদের এমনিতেই ভীষণ পছন্দ যশোধরার। সে নিজেও কতবার মাদার টেরিজার সেবাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করতে চেয়েছে। মা দেয়নি। সেবার কাজ বড্ড ভাল কাজ। বান্টির কথায় তটস্থ হয়ে চোখ নামাল যশোধরা, মৃদু স্বরে বলল, কী বলব?

বাঃ,সুন্দর তোার গলার স্বরটি।

সুনয়নী মেয়েকে আর বেশীক্ষণ এখানে বসিয়ে রাখতে সাহস পাচ্ছিলেন না। যা মেয়ে কিছু একটা আলটপকা বলে ফেলবে হয়তো। তাই তিনি খুব সংকোচের সঙ্গে বললেন, ওকে আপনাদের কিছু জিজ্ঞেস করার নেই তো!

জ্যোৎস্না প্রায় ধরা গলায় বলেন, না না। ওকে আবার কী জিজ্ঞেস করব? যাচাই করার কিছু নেই।

তাহলে ওকে ভিতরে নিয়ে যাই?

হ্যাঁ হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। আমাদের দেখা হয়ে গেছে।

অভয়নাথ পাত্রটিকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। আর সেটা তোতনও টের পাচ্ছে। অভয়নাথ পৌরুষের পক্ষপাতী। তিনি ডাকাবুকো লোক পছন্দ করেন। ম্যাদামারা পুরুষ তাঁর ঘোর অপছন্দ। এ ছোকরাকে সে হিসেবে তাঁর পছন্দ হল না বটে, কিন্তু এর একটা বাড়তি ব্যাপার আছে। ছোকরা একটু সত্যিকারের উদাসীন ভাবুক টাইপের। সম্ভবত লোভটোভ কম এবং টাকাপয়সার প্রতি তেমন টান নেই। এগুলো তাঁর নিজেস্ব পদ্ধতির ডিডাকশন। সত্যি নাও হতে পারে। ছয় হাজার ডলার অনেক টাকা। কিন্তু এধরনের ছেলেরা তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে পারে না। ড্যাশিং পুশিং নয় বলে। নইলে আরও বেশী মাইনে হত।

ভিতরের ঘরে আসতেই জ্যোঠিমা জড়িয়ে ধরলেন যশোধরাকে। সুনয়নীর দিকে চেয়ে বললেন, বলিনি, ওর আবার সাজের দরকার হয় নাকি? এই সাজেই তো সবাইকে ট্যারা করে দিয়ে এল।

যশোধরা মিটমিট করে একটু হেসে বলে, পাত্রটিকে দেখেছো?

দেখিনি আবার! বেশ ছেলে। শান্ত সুস্থির একটু কবি-কবি ভাব আছে।

যশোধরা নির্ভাজ গলায় বলে,যাই বলো বাপু আমার কিন্তু বেশী পছন্দ ওর দাদাটিকে।

সুনয়নী আর সুচেতা প্রায় একসঙ্গে আর্তনাদ করলেন অ্যাঁ।

যশোধরা খিলখিল করে হেসে ওঠে। ইতি মিতি দুজনেই হাঁ করে চেয়ে ছিল যশোধরার দিকে। ইতি বলে, যাঃ, ওর তো বয়স বেশী।

আহা, পছন্দ মানে কি আর বিয়ে করতে যাবো নাকি? লোকটা বেশ মজার আর পরোপকারী লোক আমার খুব পছন্দ। আজ সকালেই মড়া পুড়িয়ে এসেছে শুনে আমি খুব ইমপ্রেসড।

সুনয়নী একটা দুশ্চিন্তার শ্বাস ছেড়ে বললেন, পারিসও তুই লোককে চমকে দিতে।
লোকটা কি খারপ মা?
খারাপ ভালর আমি কী জানি। ওর দিকে ভাল করে তাকাইনি তো?
শুধু পাত্রটিকে দেখেছিলে?
দেখব না? বেশ ছেলে। আমার তো ভালই লাগল।
সুচেতা বললেন, মুখখানা মায়ায় ভরা। আর কিছু না হোক, মনে দয়ামায়া আছে বলেই মনে হয় বাপু। আর পাত্রের মা তো দেখলুম যশোর জন্য কোল পেতে আছেন।
সুনয়নী বললেন, হ্যাঁ দিদি, মহিলা বেশ ভাল মানুষ। দজ্জাল ধরনের নয় মোটেই।
যশোধরা মুচকি হেসে বলে, তাহলে তোমাদের পছন্দ বলো!
সুচেতা বললেন, পছন্দ হলেই তো হল না। লাখ কথার আগে বিয়ে হয়না। এখনও কত কী দেখার আছে। জানার আছে।
পাত্রপক্ষ বিদায় নেওয়ার আগে সুনয়নীকে আর একবার যেতে হল হলঘরে। জ্যোৎস্নার চোখে টলটল করছে জল। হাত দুটি ধরে বললেন, আমরা লোক খারাপ নই বেয়ান।আমাদের কোনও দাবীদাওয়াও নেই। শ্বশুরবাড়ির বংশেই কেই কখনও পণ নেয়নি। যদি মেয়েটাকে ভিক্ষে দেন তবে বড্ড শান্তি পাবো। একটু দেখেই এমন মায়া পড়ে গেল।
ওরকমভাবে বলবেন না। ঠাকুরের যা ইচ্ছে তাই হবে। আপনাদের যে মেয়ে পছন্দ হয়েছে এতেই আমরা খুশি।
পাত্রকে আর একবার লক্ষ করলেন সুনয়নী। সুচেতা ঠিকই বলেছেন, এ নরম মনের মানুষ। চোখ দুটো টানা টানা আর লাজুক-লাজুক।
পাত্রপক্ষ বিদায় নেওয়ার পর জয়নাথ আর অভয়নাথ আলোচনায় বসলেন।
কেমন দেখলে দাদা?
অভয়নাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, এক বগ্গা মত দিই কি করে ? কতটুক আর দেখলাম? তবে পাত্র খারাপ নয় বলেই মনে হয়। আরও খোঁজ খবর-খবর নেওয়ার পর গোটা পিকসার পাওয়া যাবে।
সে তো ঠিকই। নাথিং ইজ সেটেলড্ ইয়েট।
অবনীবাবুর পরিবারও ভাল। এখনও দেখা যাক।
মারাত্মক ফোনটা এল অনক রাতে। প্রায় সাড়ে দশটা নাগাত হিউস্টন থেকে অলকের গলা পাওয়া গেল, কে বলছো, বড় মামা?
হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপর খবর বল।
খবর ভাল নয়। কল ইট অফ।
তার মানে?
এখানে বিয়ে দেওয়া চলবে না।
কেন রে, কিসের গণ্ডগোল?
বেশী ডিটেলসে যাচ্ছি না। ওর সব বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে একটা ক্যাভাল আছে। বেশ স্ট্রং ক্যাভাল।
বলিস কি? সর্বনাশ।
নিউ জার্সির বাঙালী মহলে সবাই জানে। ইন ফ্যাক্ট ওই ক্যাভালের জন্য বন্ধুর বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। শোনা যাচ্ছে বন্ধুর বউকেই তোতন বিয়ে করবে। অল গেট সেট অ্যাভ গো।
তা হলে মেয়ে দেখল কেন?
কি করে বলব? তাছাড়া বন্ধুপত্নীটি এখন কলকাতাতেই আছেন। ডিভোর্স এখনও হয়নি তবে যে কোনও সময় হয়ে যাবে। কল ইট অফ বড়মামা।
আরে সে আর বলতে! তুই দুদিন আগে জানালে আমি বাড়িতে আসতেই ওদের বারণ করতাম। আমি হিউস্টনে থাকি বড় মামা। দূরের পাল্লা।
বুঝেছি। আমি এক্ষুণি ফোন করে পাত্রপক্ষকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আমরা আর এগোতে রাজি নই।

ঠিক আছে বড়মামা। তোমরা ভাল আছো তো! ছাড়ছি।

অভয়নাথকে ঘিরে বাড়ির লোকেরা অপেক্ষা করছিল। জয়নাথ, সুনয়নী, সুচেতা। প্রত্যেকের মুখই থমথমে। খবর যে খারপ তা সবাই বুঝতে পারছে।

উত্তেজিত অভয়নাথ ফোন রেখেই ভাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, বলেছি না অলকের খবর আসার আগে মেয়ে দেখানোটা ঠিক হয়নি! আমি এখনই অবনূবাবুকে ফোন করছি-

জয়নাথ দাদার হাত চেপে ধরে বললেন, দাঁড়াও দাদা। রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে। এই আনগড়লি আওয়ারে এসব না করাই ভাল। কাল সকালে ট্যাক্টফুলি জানিয়ে দিলেই হবে।

কী বলবি?

সেটা ভেবে ঠিক করা যাবে। এবার অলক কী বলল বলো।

অভয়নাথ বললেন। থমথমে মুখ করে সবাই বসে রইল।

আড়াল থেকে যশোধরাও শুনল। ধীর পায়ে হেঁটে সে বারান্দায় এসে অন্ধকার গঙ্গার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর নিজের ঘরে এসে বাতি নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে রইল উপুড় হয়ে।

তার সঙ্গে পাত্রপক্ষের কোনও সম্পর্কই গড়ে ওঠেনি। ভাল করে চেনা জানা কথাবার্তাও হয়নি। মাত্র মিনিট দশেক সে ওদের সামনে গিয়ে বসেছিল। তবু এক অনির্দেশ্য অস্পষ্ট কারণে হঠাৎ এখন তার চোখে জল এল। সহজে কান্নার মেয়ে সে নয়। তবু এখন ভারী ছেলেমানুষের মতো সে ফুলে ফুলে কাঁদল বহুক্ষণ।

তারপর চোখের জল না মুছেই ঘুমিয়ে পড়ল কখন।

সকালবেলাতেই জয়নাথ অবনীবাবুকে টেলিফোনে জানিয়ে দিলেন, এ বিয়ে হচ্ছে না। অসুবিধে আছে।

ঠিক দু'দিন বাদে ইউনিভার্সিটির ফটকের কাছাকাছি যশোধরার পাশ ঘেঁষে হাঁটতে হাঁটতেএকজন লোক বলল, আমাকে কি চিনতে পারছেন?

যশোধরা বিরক্তির সঙ্গে ঘাড় বেঁকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, না- ওঃ হ্যাঁ কী ব্যাপার বলুন তো!

আমি তোতন। আপনাকে দু-একটা কথা বলতে চাই।

কথা! আর কথা কিসের বলুন তো! আর আমিও শুনতে চাইছি না।

মুখটা খুবই ম্লান হয়ে গেল তোতনের। একটু ইতস্তত করে বলল, আপনারা কেন প্রস্তাবটা প্রত্যাখান করলেন তা আমি জানি। কিন্তু, বিয়ে না হোক, একটা ব্যাপার যদি একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে পারতাম।

খুব সতেজ গলায় যশোধরা বলে তার কোনো দরকারই নেই।

শুকনো ঠোঁট জিব দিয়ে ভেজানোর একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে তোতন হঠাৎ ওপর নিচে মাথা নেড়ে বলে, সত্যিই তো। সত্যিই আপনার শোনার কোনও প্রয়োজনই নেই। আসলে আমার মাথাটারও ঠিক নেই কি না। কোথায় যাবো, কার কাছে কী বলবো এসবই এখন গোলমাল হয়ে গেছে।

যশোধরা বলল, সেটাও আপনার ব্যাপার। আমি কনসার্নড নই।

সবই ঠিক। কি হল জানেন আপনারা রিফিউজ করার পরই আমাদের বাড়িতে একটা যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেল। মা ঠাকুর ঘরে মাথা কুটে মাথা রক্তাক্ত করে ফেলে এখন নার্সিং হোমে। বোনেরা আমাকে যাচ্ছেতাই ভাষায়- যাকগে। ওসব বলতে ঠিক আসিনি।

যশোধরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে তোতনের দিকে সম্পূর্ণ ঘুরে মুখোমুখি হয়ে বলে, আপনি কেন বুঝতে পারছেন না যে আপানাদের পারিবারিক ব্যাপার আমার জানবার কথাই নয়! প্লীজ! আপনি আর এরকম অ্যাপ্রোচ করবেন না। ওসব আপনদের সমস্যা আপনারা বুঝবেন। তোতন আবার আগের মতো ওপরে নিচে মাথা নেড়ে বলে, বুঝতে পারছি। কেন যে এলাম তাই তো জানি না। মনে হল, আপনাকে যদি একবার ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা যায়-

যশোধরা অত্যন্ত চটে গিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলে, কেন আমাকে বলবেন? কিসের প্রয়োজন আমার এসব শোনার? রাগ করবে না, প্লীজ! আমি যাচ্ছি।

তোতন পিছিয়ে গেল। তারপর দীর্ঘ পদক্ষেপে খানিকটা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নামল। কলেজ ষ্ট্রিটের উন্মত্ত গাড়িঘোড়ার দিকে ভ্রুক্ষেপও না করে রাস্তা পেরোতে যাচ্ছিল। মর্মভেদী দু-দুটো ব্রেক-এর শব্দ হল। প্রাণঘাতী সে আওয়াজে চোখ বন্ধ করে ফেলেনি যশোধরা। চোখ খুলে দেখল, রাস্তা থেকে নিজের ভূপতিত শরীরটা টেনে তুলল, তোতন। জামায় রক্ত পাজামায় রক্ত। লোক জমে যাচ্ছিল। কিন্তু তোতন কারও দিকে তাকাল না। একটু খুঁড়িয়ে ঘষটে ফের একই রকম বিপজ্জনকভাবে রাস্তা পেরিয়ে গেল পিছন থেকে। পিছন থেকে গাড়ির ড্রাইভাররা অশ্রাব্য গালাগাল দিচ্ছে তাকে।

খুব বেশী কি লাগেনি লোকটার? কিন্তু অত রক্ত! আর একটু হলে মরেই যাচ্ছিল তো!

কথা শুকিয়ে গেল যশোধরার। এ লোকটা বোধহয় শীগগীরই মরবে পথে ঘাটে। এ মাথার ঠিক নেই।

সারাদিন একটু আনমনা রইল যশোধরা।

দিন চারেক বাদে হিউস্টন থেকে আবার টেলিফোন এল অলকের।

ছোট মামা! সম্বন্ধটা ভেঙে দিয়েছো তো!

হ্যাঁ। ভাগ্যিস খবরটা দিতে পেরেছিলি। আসলে কি জানো, ছেলেটা খারাপ ছিল না। চক্করে পড়ে--এনিওয়ে কাটিয়ে

দিয়ে ভাল করেছো। আমেরিকার পাত্রই যদি চাও তো অনেক আছে। যশোরধা আবার পাত্র অভাব হবে নাকি?

আরে না। আমার একটা মাত্র সন্তানকে বারো হাজার মাইল দূরে পাঠাতে মোটেই রাজি ছিলাম না। আসলে পাত্রপক্ষের ঝোলাঝুলিতেই--

বুঝিছি। এখানে আর একটা কান্ড হয়েছে। পরাগ নামে তোতনের যে বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে ওর স্ক্যান্ডাল সে এখন বাঙালী সোসাইটির হীরো। সেন্ট্রাল পার্কে একটা মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে একাই চার চারটে ব্ল্যাককে ঠেঙিয়ে ঠান্ডা করে দিয়েছে। টিভিতে, খবরের কাগজে খুব পাবলিসিটি হচ্ছে। কোয়াইট এ সেলিব্রাইটি।

অ! তা হবে।

আর যশোর বিয়ের জন্য হুড়মুড় করো না। আজকাল বিয়েটাও কিন্তু বিজনেস। খুব সাবধান।

ওরে হ্যাঁ রে হ্যাঁ। তোর ভয় নেই।

বহোত আচ্ছা। ছাড়ছি।

।। পাঁচ ।।

শর্মিষ্ঠা: আমি ওকে ছেড়ে দেবো ভেবেছেন? আমার জীবনটা ও যেমন নষ্ট করেছে তেমনি আমিও ওকে শেষ করব। এত সহজে ও পার পাবে না আমার কাছে।

তোতন: আর কী করতে চান আপনি? শুনুন, পরাগ কিন্তু আমার খুব বন্ধু ছিল। আজ সম্পর্ক খারাপ হয়েছে বটে, বাট হি ইজ নট দ্যাট ব্যাড। আজকাল অবস্থা ভাল নয়। ফিজিক্যালি, মেন্টালি, ফিনান্সিয়ালি ক্রমশঃ গোয়িং ডাউন অ্যান্ড ডাউন। আর কী করার আছে?

শর্মিষ্ঠা: সেটা আপনি বুঝবেন না। আমি জানি আমার ভিতরে কত জ্বালা। কত অপমান, কত অসহায় অবস্থায় আমাকে ও ফেলেছিল বলুনতো! আপনে খানিকটা জানেন, সবটা নয়। বিবাহিত জীবনের কোনও সুখই আমাদের মধ্যে ছিল না। ছিল টর্চার অ্যান্ড--

তোতন: ও কথা অনেকবার হয়েছে শর্মিষ্ঠা।

শর্মিষ্ঠা: আমি আরো অনেক কথা জমিয়ে রেখেছি ভিতরে।

তোতন: আমার মনে হয় আপনার এবার একটা ডিসিশান নিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা উচিৎ।

শর্মিষ্ঠা: ডিসিশান আমার নেওয়াই আছে। আমি ওকে ডিভোর্স দেবো, তবে আমেরিকায় গিয়ে, ও কী চাইছিল জানেন? এ দেশের কোর্টে যাতে আমি মামলাটা তুলি। তাতে ও অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে যেত। আমি তা করবো না। আমি আমেরিকান কোর্টে ডিভোর্স চাইবো, উইথ ফুল কমপেনসেশনস অ্যান্ড ড্যামেজেস।

তোতন: আবার আমেরিকা যাবেন?

শর্মিষ্ঠা: আর এবার আপনাদের কারো ঘাড়ে ভর করব না। ব্যাংকে আমার ত্রিশ হাজার ডলার আছে।

তোতন: ত্রি-ত্রি হাজার! এ তো ডি... র্মা...!

শর্মিষ্ঠা: আপনার বন্ধু এটা আমাকে ঘুষ দিয়েছিল ডিভোর্সের জন্য।

তোতন: আর এই যে আড়াই লাখ পেলেন! আর এই ফ্লাট।

শর্মিষ্ঠা: এগুলো ও ঘুষ। জুতো মেরে গরু দান। একজন মেয়ের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে টাকা দিয়ে শুণ্যতা ভরানোর চেষ্টা। এরপর যখন ডিভোর্সের মামলা উঠবে তখন আমি ওকে আরও শেষ করে দেবো।

তোতন: সর্বনাশ! ত্রিশ হাজার ডলার যে অনেক টাকা শর্মিষ্ঠা। একজন মানুষের অনেক দিনের, অনেক কষ্টের সঞ্চয়। এটার কথা তো আমার জানাও ছিল না। পরাগও বলে নি।

শর্মিষ্ঠা: বলার মুখ ছিল না বলে বলেনি। ওর মা আমার গয়না আটকে রেখেছিল, মনে নেই?

তোতন: শর্মিষ্ঠা, আপনি আর একটু ভেবে দেখুন। খরচ চালাতে পারছে বলে বেচারী নিউইয়র্কের বাড়ি বিক্রি করে মফস্বলে চলে এসেছে। এ অবস্থায় কোর্ট যাই সেটলমেন্ট দিক ধাক্কাটা পরাগ সামলাতে পারবে না।

শর্মিষ্ঠা: আমি ওকে আরও ধাক্কাই দিতে চাইছি।

তোতন: কিন্তু কেন? তাতে কী লাভ? শুধু প্রতিশোধ নিয়ে যাওয়াই কি এখন আপনার কাজ?

শর্মিষ্ঠা: আই অ্যাম ইনজয়িং ইট। আমার অপমানিত আর নির্যাতিত হলে আপনিও বুঝতেন।

তোতন: ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পর আর তো প্রতিশোধ নিতে পারবেন না শর্মিষ্ঠা তখন কী করবেন?

শর্মিষ্ঠা: পারবো। ওর চোখের সামনে আমি যখন সুখের জীবন কাঁটাবো তখনও জ্বলে পুড়ে যাবে না? পুরুষ শাসিত সমাজে একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে না ও!

তোতন: আপনার এ কাজে আমিও একজন অ্যাকসেসরি হয়ে থাকছি।

শর্মিষ্ঠা: থাকবেনই তো। আপনি ছাড়া এখন আর আমার কে আছে? আপনি পাশে না থাকলে আমি কি এতটা করতে পারতাম! ওরা মা আর ছেলে মিলে এতদিনে আমাকে পাগলা গারদে পাঠানোর ব্যাবস্থা করত। নয়তো বাধ্য করত সুইসাইড করতে।

এরকম কথোপকথন কয়েকদিন আগে এক সন্ধেবেলা শর্মিষ্ঠার ফ্লাটে দুজনের মধ্যে ঘটে গিয়েছিল। জীবনে এরকম মানসিক ধাক্কা খুব কমই পেয়েছে তোতন। শর্মিষ্ঠা কি পরাগকে এভাবে শেষ করতে চায়? চাওয়া কি উচিৎ। ত্রিশ হাজার ডলার ওকে একথায় দিয়ে দিল পরাগ! তারপরও?

শর্মিষ্ঠাকে সত্যিই বিয়ে করতে চেয়েছে তোতন। মনে মনে সে স্থির করে রেখেছে এবারই আপনি থেকে তুমিতে নেমে একদিন নিরালায় প্রস্তাবটা করে যাবে। তাদের দুজনের মধ্যে একটা তড়িতবলয় তো রয়েছেই। দুজনেই কি সুখে দুঃখে পাশাপাশি হাটেনি! এখনও পরস্পরে দেখলে তারা কত খুশি হয়! ডিভোর্স হয়ে গেলে তারা দুজনে বিনা আড়ম্বরে একটু চুপি চুপি বিয়েটা সেরে ফেলবে।

কিন্তু সেই সন্ধের পর মাথায় ঝড় উঠল। কেন শর্মিষ্ঠা পরাগকে শেষ করতে চাইছে? কেন ততদূর নিষ্ঠুরতা করবে শর্মিষ্ঠা! যদি আমেরিকায় গিয়ে ডিভোর্সের মামলা আনে তাহলে পরাগকে আর নিউ জার্সির বাড়ি থেকেই উৎখাত হতে হবে। সেই বাড়ি বোধ হয় যাবে শর্মিষ্ঠার দখলে। একজন নিঃশেষিত লোককে আর কত যন্ত্রণা দেওয়া যায়?

সেই রাত্রিটায় ঘুম হলো না তোতনের। মাথা এত গরম হল যে মাঝরাতে উঠে স্নান করল সে। ছাদময় পায়চারি করল। কিছুই ভাবতে পারলনা। শুধু তারাভারা আকাশের দিকে চেয়ে ভাবল, এ জন্যটা কেন হল আমার বলো তো! না হলেই ভাল ছিল।

তোতনের এই এক সমস্যা। বাইরে তার তেমন প্রকাশ নেই, কিন্তু সামান্য আঘাত, সামান্য অপমান, সামান্য আদর, সামান্য নিষ্ঠুরতায় তার ভিতরে ভিতরে অবিরল রক্তক্ষরণ হতে থাকে। ব্যথিয়ে ওঠে বুক। আর কাউকে নয়, তখন নিজেকেই তার কঠিন শাস্তি দিতে ইচ্ছে করে।

ভূতগ্রস্তের মতো সে ছাদ থেকে নেমে এল। তার মাথায় ঝড়ের হাওয়া এসে লাগছে। গুলিয়ে যাচ্ছে বুদ্ধি। গুলিয়ে যাচ্ছে কাণ্ডজ্ঞান। শর্মিষ্ঠাকে সে যদি বিয়ে করে, তারপর একদিন শর্মিষ্ঠা যদি তা ওপরেও কোনও কারণে ক্ষেপে ওঠে তাহলে কতদূর যাবে সে?

অসহায়ের মতো, নাবালকের মতো সে মা আর বাবার ঘরের বন্ধ কপাটের বাইরে এস দাঁড়াল নিশুত রাতে।

মা! মাগো!

জ্যোৎস্না সাড়া দিলেন না।

মা গো জেগে আছো?

না, জোৎস্না জেগে নেই।

তোতন নিজের ঘরে এসে চুপচাপ বসে রইল। ঘুমহীন, বিষন্ন, করুণ।

দুদিন বাদে সে আর একবার শর্মিষ্ঠাকে নিরস্ত করতে গিয়েছিল।

শর্মিষ্ঠা, এরকম করবেন না। আপনি আপনার জীবন নিয়ে থাকুন। স্পেয়ার পরাগ।

হঠাৎ কেন পরাগের জন্য আপনি এত অস্থির হচ্ছেন?

পরাগের জন্য নয়। পরাগ নিমিত্ত মাত্র। আমি আপনার নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে পারবো না।

শর্মিষ্ঠা তার দিকে গভির চোখে চেয়ে গাঢ় গলায় বলল, আমি জানি তোতন, আপনি আমাকে-- । আর আমার কথা কী বলব? যদি আমার জীবনটা এরকম নষ্ট না হত তাহলে কত সহজভাবে আমি আপনাকে ভালবেসে ফেলতাম। কিন্তু এবার আপনি আমাকে একটু বুঝবার চেষ্টা করুন। পরাগকে আমি নিজের পারসোনাল কারনেই শুধু শেষ করছি না। আমি একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই। এমন একটা একজামপল্ যা থেকে ওরকম কাপুরুষরা শিক্ষা নিতে বাধ্য হবে।

কেন যে শর্মিষ্ঠা এই ঘোষনার পরেই হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল কে জানে। কিন্তু তোতনের মাথার মধ্যে ভূতের মাতুল নড়তে লাগল। বুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে। গুলিয়ে যাচ্ছে চিন্তাশক্তির পারম্পর্য।

শর্মিষ্ঠা! শর্মিষ্ঠা !

অনেকক্ষণ বাদে শর্মিষ্ঠা দরজা খুলে বেরোলো। থমথমে মুখ।

কি বলছেন তোতন?

আমার মনটা ভাল নেই শর্মিষ্ঠা ।

জানি। আপনি আমার অ্যাটিচুড দেখে খুশি হচ্ছেন না। আপনি বড্ড নরম মনের মানুষ। খুব ইমপ্র্যাকটিক্যালও বটে। আমি আপনাকে জলের মতো বুঝতে পারি। কিন্তু আপনি যে কেন আমাকে বোঝেন না!

আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না আজকাল। আই কিউ কমে যাচ্ছে।

তা নয় তোতন। জীবনের কঠিন দিকগুলো তো আপনি দেখেন নি। পরাগ যখন আইস পিক দিয়ে আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল, যখন গলফ স্টিক বা টেনিস র‍্যাকেট দিয়ে মেরে ছিল তখন আমিও জীবনের কঠিন দিকগুলোকে প্রথম দেখলাম।

আপনি কি কিছুই ভোলেন না?

ভোলা কি সোজা কথা তোতন? ভুলবার জন্যইতো এত আয়োজন আমার। আপনি ভাববেন না, লক্ষীটি, আমি কিন্তু বরাবর এরকম থাকবো না। আমি এরকম নই। আমি ভীষণ আদুরে, ভীষণ নরম, ন্যাগিং, ফান-লাভিং, লাভ-লাভিং। আমি এরকম নই তোতন। কিন্তু আই মাস্ট এলিমিনেট পরাগ।

শর্মিষ্ঠা, আমি যদি আপনাকে খুব খুব ভালবাসি, সব ভুলিয়ে দিতে পারি, তাহলে কি পরাগকে উপেক্ষা করতে পারবেন না?

আপনি আমাকে খুব ভালবাসেন এই একটা আশা নিয়েই তো বেঁচে আছি। আজ তোতন না থাকলে আমি কবে ভেসে যেতাম। শুনুন, আমি আপনার সঙ্গেই আমেরিকা যাবো। ডেট ঠিক করে আমাকে জানাবেন।

তোতনের অস্থিরতা কাটল না। সে আজ বুঝতে পারছে হঠাৎ, শর্মিষ্ঠাকে সে তীব্রভাবে ভালবাসে। কিন্তু তীব্রতার মধ্যে জ্বালাও আছে। বড্ড জ্বালা। কারণ সে এটাও বুঝতে পারছে, তার মতো বাস্তববোধ বর্জিত, ভাবালু, বিষন্ন ও আত্মমুখী মানুষের সঙ্গে শর্মিষ্ঠার কোথায় যেন একটা অমিল, শর্মিষ্ঠার অনেকটাই সে বুঝতে পারছে না।

দুদিন বাদে শর্মিষ্ঠার ফ্ল্যাটে নিয়তি-নির্দিষ্টের মতো চলে গেল তোতন। যেন এক সম্মোহন তাকে অবিরল টানছে। সে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না ওই মায়ার টান।

এক ভীষণ আলুথালু চেহারা নিয়ে শর্মিষ্ঠা স্তব্ধ ও অনড় বসে রইল কিছুক্ষণ তার সামনে। তারপর দুর্বল গলায় বলল, আপনি কতদিন হয় এসেছেন তোতন?

দু'মাস। আরও হয়তো মাস খানেক থাকতে পারে।

আপনি আসার আগে আমেরিকায় কোনও ঘটনার কথা শুনে আসেন নি?

আমেরিকায় সর্বদাই ঘটনা ঘটছে শর্মিষ্ঠা। কী শুনব ?

আমি পরাগের কথা বলছি।

পরাগ ! তোতন হঠাৎ অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠে বলে, কী হয়েছে পরাগের? ইজ হি ডেড?

শর্মিষ্ঠা নিঃশব্দে উঠে গিয়ে একটা লম্বা খাম এনে সামনে টেবিলে ফেলে দিয়ে বলল, চিঠিটা পড়ুন।

কাঁপা হাতে চিঠিটা নিয়ে তোতন চোখ বুজল। অনেকেই শর্মিষ্ঠা আর পরাগের ছাড়াছাড়ির জন্য তাকেই দায়ী করে। এখন কি পরাগের মৃত্যুর পরোক্ষকারণও সেই হয়ে দাঁড়াল?

ভয় নেই, পরাগ মরেনি। খামের মধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস্ আর একটা লোকাল কাগজের কাটিং আছে। পড়ে নিন।

তোতন কাটিংগুলো বের করল। দেখল। তারপর ধীরে ধীরে দীর্ঘ চিঠিটা শেষ করল।

কী মনে হচ্ছে তোতন?

পরাগ তো ঠিক এরকম নয়।

ট্রায়িং টু বি এ হিরো। তাই না?

তোতন মাথা নাড়ে, না। তা নয় শর্মিষ্ঠা। পরাগ বড্ড ফাঁকা হয়ে গেছে। বড্ড শূন্য, একা, নিঃসঙ্গ। খানিকটা গরিবও। আমি দেখে এসছি ওর সঙ্গে কেউ আজকাল মেশে না। টোটাল ফ্রাস্ট্রেশন। পরাগ কার জন্য হীরো হবে?

ইজ ইট এ কামব্যাক?

ওখানে না গেলে বোঝা যাবে না।

শর্মিষ্ঠা দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর তোতন নির্ভুল বুঝতে পারল, হাতের আড়ালে শর্মিষ্ঠা কাঁদছে।

তোতন আর একবার চিঠিটা পড়ল। পরাগ দাড়ি রাখছে। পরাগচ্যানেল ফোর-এ একটা দারুণ ইন্টারভিউ দিয়েছে। পরাগকে সামনের পুজোয় সংবর্ধনা দেবে বাঙালী ক্লাব। মাত্র দু' মাসের মধ্যে এত কিছু ঘটে গেল কি ভাবে?

আপনি কাঁদছেন কেন শর্মিষ্ঠা?

শর্মিষ্ঠা জবাব দিল না। হাতের চাপা সরাল না মুখ থেকে।

তোতন বলল, খবরটা আমার কাছে খুব খারাপ খবর নয়। সেন্ট্রাল পার্কে হারলেমের গুন্ডাদের হাতে খুন হওয়াটাই স্বাভাবিক ঘটনা। পরাগ যে বেঁচে গেছে তা বরাতজোরে। আই অ্যাম হ্যাপী।

অনেকক্ষণ বাদে শর্মিষ্ঠা মুখ থেকে হাত সরাল। চোখ মুছল। তারপর বলল, জানি, পরাগের ওপর ভীষণ দুর্বলতা আপনার।

তোতন মৃদু স্বরে বলল, আমার দু-তিন বছর আগে ও আমেরিকায় যায়।

আমার যাওয়ার ব্যাপারে পরাগ অনেক সাহায্য করেছিল। আমি প্রথম উঠেছিলাম ওর কাছেই। তখন ও ছোট একটা ফ্ল্যাটে থাকত। মাত্তু মাসী আমাকে খুব যত্ন-আত্তি করতেন। ভালও বাসতেন খুব।

শুধু আমার জন্যই আপনাদের সম্পর্কটা বিষ হয়ে গেল!

আপনার জন্য হবে কেন? ঘটনার সব দায় তো আপনার নয়।

শুনুন আমি আর নেরী করতে চাই না। পরাগ খুব বেশী হিরো হয়ে ওঠার আগেই আমি ওর সামনে হাজির হতে চাই। আপনি কবে যাবেন?

আপনি যদি বলেন তো কালই যেতে পারি। কিন্তু ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

সেটাই তো বোঝাতে পারছি না। আমি যে ভীষণ অস্থির।

কেন অস্থির শর্মিষ্ঠা? এই ঘটনায় অস্থির হওয়ার কী আছে?

পরাগ যে নষ্ট ইমেজ আবার রিকভার করছে। ওকে এখনই ভেঙে ফেলা দরকার তোতন।

ছিঃ শর্মিষ্ঠা। আপনাকে এরকম দেখতে আমার ভাল লাগেনা।

শর্মিষ্ঠা হঠাৎ উঠে কাছে এল। দু চোখে দরদর করে জল বেয়ে পড়ছে। ভেসে যাচ্ছে মুখমন্ডল। তোতনের পাশে বসে হাঁফধরা গলায় বলল, এখনই তোতন। এখনই। ওকে শেষ করে দিতে হলে এখনই। নইলে বড় দেরী হয়ে যাবে।

এরকম অস্থির চঞ্চল অস্বাভাবিক কখনও দেখেনি শর্মিষ্ঠাকে তোতন। এমনকি যখন পরাগের হাত মার খেয়ে পালিয়ে এসেছিল তখনও নয়। সে একটু সাবড়ে গিয়ে বলল, কেন শর্মিষ্ঠা, এখনই কেন?

আপনি বুঝবেন না, কিছুতেই বুঝবেন না কেন' আপনি যে কেন এত ভাল মানুষ'

তার মানে কি বোকা?

শর্মিষ্ঠা ফের ফুলে কাঁদছে।

হঠাৎ তোতনের মাথায় একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে যা দেখেছে এবং দেখে যা ভেবে নিচ্ছে তা হয়তো সম্পূর্ণ ভুল। তা হয়তো এক মারাত্মক অপব্যাখ্যা। শর্মিষ্ঠার এইসব প্রতিক্রিয়া আসলে কিসের? কেন? এ সবই কি শুধুই ঘৃণা, আক্রোশ, প্রতিশোধস্পৃহা? আর কিছু নয়? আর কোনও গভীর অর্থ নেই?

তোতন খুব নিরস্ত গলায় বলে, আপনি কবে যেতে চান শর্মিষ্ঠা?

কালকেই যদি সীট পাওয়া যায়।

আমি যদি আর ক'দিন পরে যাই, একা যেতে কি আপনার অসুবিধা হবে?

সংবেগে মাথা নেড়ে শর্মিষ্ঠা বলে, না না, একা যেতে কোনও অসুবিধা নেই। আমাকে যেতেই হবে।

তোতন ম্লান হেসে বলে, গিয়েই ডিভোর্সের মামলা করবেন তো?

করব তোতন। আরও অনেক কিছু করব। আমাকে যাওয়ার ব্যাপারে একটু সাহায্য করবেন না?

করব শর্মিষ্ঠা। তবে কালকেই যে প্লেনের সীট পাওয়া যাবে এমন নয়।

যত তাড়াতাড়ি হয়। আমি গোছগাছ সেরে ফেলেছি।

তোতন ওপর-নিচে মাথা নাড়ল। তারপর ক্রন্দনরতা শর্মিষ্ঠাকে একা ভার কান্না কাঁদতে দিয়ে চলে এল তোতন।

মা রোজ বিয়ের জন্য ঘ্যানঘ্যান করছে আজকাল। রোজ। পরদিন সকালে সে মাকে বলল, ঠিক আছে মা। যা চাও তাই হবে।

জ্যোৎনা যেন আলো হয়ে উঠে বললেন, করবি বিয়ে?

করব।

আমরা পছন্দ করে দেখে দেবো চিন্তা করিস না।

তোমরা যাকে গলায় ঝুলিয়ে দেবে তাকেই মেনে নেবো মা।

ওমা, তুই দেখবি না?

না মা, মেয়েদের দেখে কিছুই বুঝতে পারি না আমি। আমার একদম বুদ্ধি নেই। আমি বড্ড বোকা মা।

বোকাই তো। কত লেখা পড়া শিখলি, বিদেশে গেলি, এখনও কি বুদ্ধি পেকেছে তোর! যাক বাবা, আমি কিন্তু ছাড়ছি না তোকে। একেবারে বিয়ে করে যাবি।

আ চাকরি?

চাকরি ছাড়তে হয় ছাড়বি। তোর অত বিদ্যে, ঠিক ফের চাকরি পাবি। কথা দে।

তোতন সামান্য গম্ভীর হয়ে বলে, পরের বার হলে হবে না?

না। এবারই।

জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নিতে একমিনিট ভাবল তোতন।

তারপর বলল, দিলাম। তবে কিছুতেই আর এক মাসের বেশী ছুটি এক্সটেন্ড করা যাবে না কিন্তু।

তাই হবে বাবা। এদেশে কি পাত্রের অভাব!

এসব মাত্র দিন দশেক আগের কথা। কিন্তু মনে হচ্ছে কত দিন কেটে গেছে। যেন পূর্ব জন্মে ঘটেছিল এসব। দুদিনের মাথায় দিল্লি থেকে এয়ার ইন্ডিয়ান ফ্লাইটে জায়গা পেল শর্মিষ্ঠা। তাকে কলকাতার এয়ারপোর্টে বিদায় জানাতে গিয়েছিল তোতন। পরাগকে শেষ করতে যাচ্ছে শর্মিষ্ঠা কিন্তু তেমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে না মোটেই। বরং আমেরিকায় কেনেডি এয়ারপোর্টে প্রথম যেদিন দেখেছিল তোতন সেরকমই করুণ আর নার্ভাস দেখাচ্ছে।

তোতন বলল, গিয়ে কোথায় উঠছেন?

অনন্যা বউদির কাছে। দাদা ট্রাংক কল-এ খবর দিয়েছে। ওরা এয়ার পোর্ট থেকে নিয়ে যাবে।

আপনি কবে আসছেন তোতন?

একটু দেরী হতে পারে। বাড়ি থেকে ছাড়ছে না।

আমি খুব অপেক্ষা করব কিন্তু।

আপনাকে একটু নার্ভাস দেখচ্ছে।

তাই বুঝি! কিন্তু আপনাকে অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

কিছু বুঝতে পারছি না। বোধ হয় আপনি চলে যাচ্ছেন বলে।

আহা, সে আর কতদিনের জন্য? আপনি তো আসছেনই।

হ্যাঁ। আমি তো আসবোই। কিন্তু--

কিন্তু কি বলুন তো!

কিছু বুঝতে পারি না কেন আজকাল!

শর্মিষ্ঠা হাসল, আপনি যা ভাবুক।

সবাই তাই বলে। আমার মাথায় কেবল আজে বাজে ভাবনা। কাজের ভাবনা আসে না।

তা জানি। কেজো লোককে সবাই পছন্দ করে বলে ভাবেন নাকি? ভাবুকদেরও ফ্যান আছে। ভাবুকপানাই কাউকে কাউকে মানায়।

শর্মিষ্ঠা চলে গেল। কলকাভায় আর একটা ছোট্ট শূণ্যতার সৃষ্টি হল।

দশদিনে কত কী হয়ে গেল! তোতন বিকেলে শুয়ে আছে বিছানায়, রক্তে ভেস গেছে চাদর। মাথায়, পিঠে, হাঁটুতে, উরুতে প্রবল যন্ত্রণা। বাঁ হাত নাড়াতে পারছে না সে। বিছানার পাশে মুখ চুন করে শুধু বসে আছে রতন। বাড়িতে আর কেউ নেই। নার্সিং হোম-এ মায়ের অবস্থা ভাল নয়। মাথায় গুরুতর চোট। কতখানি গুরুতর তা জানার জন্য কাল স্ক্যানিং হবে। আজও ঘন ঘন মূর্ছা হচ্ছে।

সবই আমার জন্য রতন, সবই আমার জন্য।

দাদা, আপনি শান্ত হোন। ওরকম ছটফট করলে আরও রক্ত যাবে।

তুমি কি জানো রতন যে, আমি আমার বন্ধুর জীবন নষ্ট করেছি! আমার মা আজ--

তোতনের চোখের জল, মাথার রক্ত, মুখের লালা সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে হাঁফ ধরে যাচ্ছে তার। দম বন্ধ হয়ে আসছে। শরীরের যন্ত্রনা সে অনুভব করছেই না। তার বুকের যন্ত্রণা হাজারো গুণ।

ডাক্তার আসছে দাদা। আপনি ওরকম করবেন না।

তুমি জানো না রতন। তুমি জানো না এ পরিবারকে কতখানি অপমান সইতে হল আমার জন্য।

সব জানি দাদা। বড় ঘরের ব্যাপার হলেও বুঝি।

বালিশে মুখ চেপে তোতন শিশুর মতো কাঁদতে লাগল।

তোতন দা, অনেক রক্ত চলে যাচ্ছে আপনার। অত ছটফট করবেন না। জীবনে কত কি হয়। আমরা কিভাবে বেঁচে আছি বলুন তো লাথি-ঝাটা খেয়ে? অস্থির হয়ে কিছু করা যায় দুনিয়ায় বলুন? দুর্দশায় পড়লে, বিপদ হলে আমি কি করি জানেন? ভাবতে থাকি আমার চেয়েও কারাপ অবস্থায় কত লোক তো দুনিয়ায় বেঁচে আছে। কত তিখিরি, কাঙাল, কুষ্ঠরোগী, কত ক্যানসর-হওয়া মানুষ, কত হাবাগোবা কানা খোঁড়া। ওইসব ভাবতে ভাবতে আবার জোর পেয়ে যাই। মনের জোরটাই আসল কথা। যা হওয়ার হোক না।

তোতন মাথা নেড়ে বলে, আমার এক রত্তি মনের জোর নেই রতন।

জোড় করলেই জোড় হয়। দাঁড়ান, কলিং বেল বাজল বোধ হয়। ডাক্তার এল কিনা দেখে আসি।

ডাক্তার এল। পরিবারের পুরোনো ডাক্তা, প্রতিবেশী। প্রবীণ লোক। এ কী করেছিস রে? অ্যাকসিডেন্ট নাকি?

তোতন হাঁফধরা গলায় বলে, হ্যাঁ ডাক্তারকাকা।

দেখি দেখি দাঁড়া! এ তো দেখছি বেশ সিরিয়াস চোট! ম্যাল্টিপল ইনজুরি। মাথাটা দেখি তো! সর্বনাশ! মাথা তো ফাটিয়ে এসেছিস!

তোতন চোখ বুজে রইল। তার কাটা-ছেঁড়া-ভাঙা শরীরের ওপর কী হতে লাগল তা নিয়ে সে মাথা ঘামল না। শরীর যে কিছুই নয় সেটা সে আজ খুব বুঝতে পারছে। মনে এত জ্বালা যে শরীরকে ভুলেই গেছে সে।

সম্ভবত ঘুমের ইঞ্জেকশনই ঠেলে দিলেন ডাক্তারবাবু। দিতে দিতে বললেন, ইনজুরিটা ভাল বুঝছি না। দরকার হলে কাল এক্সরে করাতে হাবেন।

তোতন টের পেল, ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। তার শরীরে ক্লান্তি নেমে আসছে।

রতন!

বলুন।

ডাক্তার কি আমাকে ঘুমের ওষুধ দিল?

ঠিক জানি না। ইনজেকশন তো দিল দেখলাম।

শোনো, আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি আর আমার মায়ের যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে কি হবে?

কিছু হবে না। আপনি ঘুমোন।

ওরা কেউ ফেরেনি?

না। বাড়িতে কেউ নেই। শুধু নোটনদা যে বাচ্চাটাকে এনেছে সে রান্নাঘরের সামনে চট পেতে ঘুমোচ্ছে।

তুমি ফোন করতে জানো?

বাঃ জানব না? অফিস থেকে কত করি।

নার্সিং হোম-এ ফোন করে খবর নেবে একবার?

আমি তো সেখান থেকেই এলুম একটু আগে।

তবু একবার খবর নিও।

নোবো। বাড়ির লোকেরাও এবার ফিরবে।

শোনো, বাড়ির কেউ আমার অ্যাকসিডেন্টো কথা জানে না। তুমিও কাউকে বোলো না। ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দেবে? তুমি বরং হলঘরে থাকো।

আচ্ছা। আর একটা কথা রতন। বলুন। তুমি খুব ভাল ছেলে। কী যে বলেন!

যদি ভাল হই, যদি মা ভাল হয়ে ওঠে, একবার তোমার গাঁয়ে যাবো। নিশ্চয়ই যাবেন।

রতন, কেউ কখনও তোমাকে অপমান করেছে?

কী যে বলেন! আমাদের লাঞ্ছনা গঞ্জনা কি শেষ আছে! অপমান ছাড়া দিন যায় নাকি একটাও?

কোনও মেয়ে?

আমাদের ছোটোলোকদের কথা বাদ দিন। রামেও মারে, রাবণেও মারে।

তুমি ভাল ছেলে রতন।

বাতিটা নিবিয়ে দিলাম দাদা। আপনি ঘুমোন। আমি হলঘরে বসে রইলাম।

ঘুমের ওষুধ কেন দিল বলো তো! আমার যে জেগে থাকাই দরকার। ওরা এলে আমাকে ডেকে দেবে?

দেবো।

আমার বাবার বয়স হয়েছে। এবার এই মেন্টাল শক খুব খারাপ। রতন, আমার বাবার কিছু হবে না তো!

আপনি কেন অত ভাবছেন? যা হয়নি তা নিয়ে ভাবতে নেই।

সব কিছু যে আমার জন্য হল। শুধু আমার জন্য। রতন, টেলিফোনের শব্দ হচ্ছে না! শীগগির যা নিঃশেতি পানপাত্রের মতো।

কিন্তু শুনতে পাচ্ছি চাকরিতে নাকি উন্নতি হবে শীগগিরই।

সেটা হতে পারে। কী যায় আসে তাতে। উন্নতি না হলেও গ্রাসাচ্ছাদন চলে যবে কোনওমতে।

রোজ জগিং করছেন?

হ্যাঁ। ডাক্তররা বলেছে।

রোজ ভোরে?

হ্যাঁ।

কটার সময় ওঠেন?

পাঁচটা।

তারপরই বেরন?

মিনিট পনেরোর মধ্যেই বেরিয়ে পড়ি। কেন বউদি?

বাব্বাঃ, পারেনও আপনি। আমার কথাটি তো ফিজিক্যাল ফিটনেসের ধারও ধারেন না। আর বণ্ডা-গুণ্ডাদের সঙ্গে দেখা হয়নি তো?

প্রাণে মারে, না বউদি। তবে এখন আমিও তাদের খুঁজি। তারা বড় পয়মন্ত।

সামনের উইক এন্ডে আসতে পারবেন?

আবার নেমন্তন্ন!

অসুবিধে কি? আমি কি খারাপ রাঁধি?

না, তা বলছি না।

প্লীজ। আসবেন। সঙ্গী সাথী কেউ থাকলে তাকেও আনতে পারেন।

আমার আবার সঙ্গী সাথী কোত্থেকে জুটবে?

যদি গার্ল ফ্রেন্ড কেউ জুটে গিয়ে থাকে ইতিমধ্যে। এত প্রোপোজাল আসছে, এখন—।

পরাগ করুণ গলায় বলে, আমাকে নিয়ে ঠাট্টা কেন বউদি? একটা জীবন্মৃত লোক পরিবার, আপনার মায়া হয় না ঠাট্টা করতে?

হয়। খুব হয়। আসবেন কিন্তু ভাই।

যাবো।

পরাগ এইসব নেমন্তন্ন বিশেষ পছন্দ করে না। বাঙালীদের বাড়িতে ন্যানা কথা ওঠে। হাঁড়ির খবর বেরিয়ে পড়ে। ওসব আর ভাল লাগে না পরাগের। সে একটা নিস্পৃহ, নিস্তরঙ্গ জীবন যাপনের বলয় তৈরি করে নিচ্ছে তার চারপাশে। খুব ধীরে ধীরে। কোনও ঘটনা ঘটবে না, কোনও উত্থান-পতন থাকবে না, শুধু ধীরে ধীরে সময় গড়িয়ে যাবে। তার পক্ষে এর চেয়ে বেশী কাম্য আর কী হতে পারে?

ফল শেষ হয়ে একটু একটু শীত পড়তে শুরু করেছে। সকালে বেরোতে বেশ কষ্ট হয় আজকাল। চনচনে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যায় এ-সময়ে। পরাগ কিছু গরম জামাকাপড় বের করেছে বাক্স প্যাঁটরা ঘেঁটে।

ভোরবেলা দৌড়াতে কী যে ভাল লাগে পরাগের। সতেজ বন্য গন্ধ-সহ বাতাস যেন জাপটে ধরে তাকে। আকাশ যেন নেমে আসে বুকের মধ্যে। ভগিং নয়, সে আজকাল সত্যিকারের দৌড়োয়। ক্রস কান্ট্রি রানারের মতো সে উচ্চাবচ ভূমিখণ্ড অনায়াসে হরিণের মতো পার হয়।

সকালে আজ তার গায়ে জ্যাকেট, জ্যাকেটের নিচে ট্র্যাক স্যুট। পায়ে উলের মোজা।

রাস্তা এক চৌপাটে পার হয়ে তার প্রিয় অরণ্য ভূমিতে ঢুকে পড়ল পরাগ। আমেরিকাকে এই একটি কারণেই ভীষণ ভালবাসে পরাগ। এত গাছ, এত বন-জঙ্গল, এত শুদ্ধ প্রকৃতি। এরকম আর কোথায় আছে।

ঘন নীল ট্র্যাক স্যুট আর মাথায় হুড পরা একটি মেয়ে প্রায় পাশাপাশি চলে এল। নিনাই বোধ হয়।

হাই রয়, ওল্ড ইউ ডেট মি এভার!

হুডের তলা থেকে নিনার গলাটা অন্যরকম শোনাল; পরাগ তাকাল না।

বলল, ইয়াঃ মাই ডিয়ার, সাম ডে; মে বি ভেরি সুন।

রোজই নিনা ডাক ছাড়িয়ে যায়। আজ পিছিয়ে পড়ল।

হাই নিনা, হোয়াটস দা ম্যাটার উইথ ইউ, ক্যাচ মি আপ।

নিনা একটু পিছন থেকে অসহায় গলায় পরিষ্কার বাংলায় বলল, আমি কি অত ছুটতে পারি?

পরাগ থমকে দাঁড়াল।

কে?

মেয়েটি গড়ানে রাস্তা ধরে উঠে এল কাছকাছি। হুড যখন খুলে দিল তখন তার সেই বিখ্যাত দুটি চোখ অজস্র জলধারা ভেসে যাচ্ছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে।

একটা ছোট্ট হার্ট অ্যাটাক সামলে নিল পরাগ। অস্ফুট গলায় বলল, তুমি! এখানে! এভাবে!

আমি নিজে কিছু বুদ্ধি করে করিনি। বউদি শিখিয়ে দিয়েছে। রাত থাকতে

উঠে...

কাঁদতে কাঁদতে এর বেশী আর বলতে পারল না। ফোঁপানিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

জীবনের কাছ থেকে পরাগ খুব বেশী কিছু আশা করে না আর। খুব বেশী কিছু নয়। বিবর্ণ, কুণ্ঠিত, সন্দেহাকুল গলায় সে মৃদু প্রশ্ন করে, কী চাও তুমি?

কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ জ্বলে উঠল তার চোখ। বৃষ্টিতে যেমন জ্বলকে ওঠে বিদ্যুৎ। কান্নায় জড়ানো তীব্র স্বরে সে বলে উঠে। আমি কি চাই! আমি কি চাই! আমি কি চাই! আমি চাই তোমাকে শেষ করতে! শেষ করতে, একেবারে শেষ করতে!

মেয়েটি দুম দুম করে কিল মারছিল পরাগের বুকে। তারপর বুকের মধ্যেই গুঁজে দিল মাথা অস্ফুট গলায় বলল, তোমাকে কত ঘেন্না করি জানো না! জানি!

তোমাকে কিছুতেই হীরো হতে দেবো না আমি। কিছুতেই না। সব কেড়ে নেবো। ভিখিরি করে ছেড়ে দেবো তোমায়। বুঝলে!

শুকনো গলায় পরাগ বলল, বাড়ি যাবে?

কেন বাড়ি যাবো? বলে মেয়েটি মুখ তোলে। সেই দুটি চুম্বক চোখ, তাতে জলধারা ও বিদ্যুৎ কেন বাড়ি যাবো? কার বাড়ি?

কারও নয়। বাড়ি। শুধু বাড়ি। যখন যার তখন তার।

না মোটেই তা নয়। কেন বাড়ি যাবো বল!

তা জানি না। মনে হয় তোমার একটু বিশ্রাম দরকার।

কেন বিশ্রাম?

রুমাল দিচ্ছি, নাকটা মুছে নাও।

কেন মুছবো তোমার রুমালে? বলো কেন মুছবো?

দ্বিধাগ্রস্ত একখানা হাত বাড়াল পরাগ। সন্তর্পণে স্থাপন করল শর্মিষ্ঠার কাঁধে, খুব চমকে দিয়েছো আমাকে।

কেন চমকাবো না? কেন তুমি শেষ হতে হতে ফের বেঁচে উঠলে? কেন উঠলে? আমি যে অন্য প্লান করে রেখেছি, কেন ভেস্তে দিলে?

কিসের প্লান শর্মিষ্ঠা?

শেষ করে দেবো তারপর এসে ঠিক বাঁচিয়ে নেবো। কেন তা হতে দিলে না?

আমাকে শেষ করারও কিছু নেই। বাঁচানোরও কিছু নেই। আমি সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত।

কেন প্রস্তুত? তুমি খারাপ, তুমি ভীষণ খারাপ।

পরাগ সঙ্গে মাথা নেড়ে সমর্থন করে বলে,হ্যাঁ আমি তা জানি। আমি সত্যই খারাপ। কেন যে খাপ তা বুঝতে পারি না।

কেন ভাল লোক হলে না তুমি?

কপাল শর্মিষ্ঠা। আমার ভাইটা যদি অ্যাক্সিডেন্টে মারা না যেত তাহলে–তাহলে হয়তো–

তোমার রুমাল দাও। শুনছো! তোমার রুমাল!

দিই। এই যে–

কেন বাড়ি যাবো বললে না?

জানি না। কেন বাড়ি যায় লোক? কি আছে বাড়িতে? আমার তো মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছেও করে না।

না, ওটা কথা নয়। আমি কেন বাড়ি যাবো বলো।

তোমার ইচ্ছে হয় না?

ওটা জবাব হল না। আমি কেন তোমার বাড়ি যাবো?

বাড়ি কি আমার?

তবে কার? বলো।

পরাগ এবার একটু হাসে। তারপর ঘড়ি দেখে।

ঘড়ি দেখলে কেন?

এমনিই।

না বলো, কেন ঘড়ি দেখলে?

সূর্যোদয়ের সময়টা মিলিয়ে নিলাম।

কার বাড়ি?

তোমার।

তাহলে কার বাড়ি কে যাবে?

তোমার বাড়িতে তুমি।

আর তুমি নও?

যদি বলো, তাহলে আমিও।

চোখ মুছল শর্মিষ্ঠা। মুখ মুছল।

এবার? এখন আমরা কী করব?

কী সুন্দর বল দেখছো না!

দেখছি। নিউ ইর্য়কে এসব ছিল না। কী ভাল জায়গাটা!

তোমার পছন্দ?

ভীষণ।

তাহলে চলো, একটু বেড়াই।

দীর্ঘ দীর্ঘ গাছ, ঝোপজাড় আর ভোরের আলো ছায়ায় দুজন মন্থর পায়ে হাঁটতে লাগল অনেকক্ষণ তারা আর কথা বলল না। চুপচাপ। শুধু পরস্পরকে অনুভব করা। কথা দিয়ে কি সব দূরত্ব অতিক্রম করা যায়? নীরবতাও লাগে।

কুঠিঘাটের বাড়িতে অলকের টেলিফোন এল অধিক রাতে।

বড়মামা নাকি!

হ্যাঁ, কী খবর রে তোর?

ওঃ বড় ম্যা, সামথিং ইজ রং।

আবার কী হল?

আই ওয়াজ ফেড এ কংককটেড্ স্টোরি।

উঃ অত ইংরেজি বলিস না তো! হয়েছো কী?

ওই যে পরাগ আর শর্মিষ্ঠার ব্যাপারটা–

কে পরাগ আর শর্মিষ্ঠা?

আরে ওই যে তোতনের সঙ্গে যাকে নিয়ে স্ক্যাণ্ডাল, সেই বই তো ফিরে এসে দিব্যি স্বামীর ঘর করছে।

অ্যাঁ। তাহলে কী খবর দিয়েছিলি তুই?

বললাম না, একদম গুজব।

যাঃ কিন্তু সে বিয়ে তো নাকচ হয়ে গেছে।

তাতে কিছু নয়। যশোর আরও ভাল পাত্র জুটবে। কিন্তু আমি সত্যিই সরি মামা। একটা ভুল খবর দিয়ে।

ভাল করে খোঁজ নিতে হয়। এতে খুবই ক্ষতি হয়ে গেছে।

কী ক্ষতি হল?

আমাদের নয়। ওদের। ভদ্রমহিলা ভীষণ শকড্। আর তোতনও–যাকগে এত সব লং ডিসট্যান্স বলা যায় না। চিঠি লিখে বরং জানাবো। ইটস্ এ লং স্টোরি।

এখন ইংরেজি কে বলছে বড়মামা?

আমেরিকায় আছো বলে কানটা মলতে পারছি না, তাই না? কিন্তু জমা রইল। দামড়া কোথাকার। তোর জন্য একটা পরিবার একেবারে–কী কাণ্ড বল তো! ছিঃ ছিঃ।

আমি কী করব বল। থাকি হিউস্টনে। দূরের পাল্লা।

তা বলে–। যশোর বোধহয় এখানে একটু ইচ্ছেও ছিল।

তিন মিনিট হয়ে এল মামা। ছাড়ছি।

ফোন রাখার পর জয়নাথ শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী বলল দাদা?

অভয়নাথ সখেদে মাথা নেড়ে বললেন, সে আর জানতে চেও না। তার আগে বলো, আর উই ব্যাড পীপল?

জয়নাথ মৃদু হেসে বললেন, সেটা আমাদের শত্রুদের জিজ্ঞেস করা ভাল। তুমিই বলো না।

জানি না দাদা। ভাল-মন্দের বিচার তো সরল নয়।

আমরা ওদের রিফিউজ করলেও ফোনে খোঁজ খবর নিয়েছি। উই ওয়্যার সিমপ্যাথেটিক।

নিশ্চয়ই।

আমরা দুঃখিতও হয়েছি। তা তো বটেই।

এখনও যদি কিছু কমপেনসেট করা যায় তো করবে নাকি?

জয়নাথ মৃদু হেসে বললেন, কী করতে চাও দাদা?

সেটা ভেবে দেখতে হবে।

ভেবে কিছু পাওয়া যাবে কি?

সেটা ভাববার পর ঠিক হবে।

কী বলল অলক?

সবই নাকি গুজব।

জয়নাথ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ছেলেটিকে তার পছন্দই ছিল।

সেই দিন থেকে আজ অবধি যশোধরা সুস্থির হয়নি। তার বুকের অবাধ্য কাঁপন ভূমিকম্পের মতো অবিরল কী যেন ভেঙে ফেলছে তার ভিতরে। চোখ বুজলেই সে দেখতে পায় উদ্‌ভ্রান্ত একটি যুবক কলেজ স্ট্রিটের মতো সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক এক রাস্তায় কেমন অন্ধের মতো নেমে গেল। যে জায়গায় পড়ে গিয়েছিল তোতন সেখানে কালো রাস্তায় অনেকটা রক্ত ছড়িয়ে ছিল। পরে দেখেছে যশোধরা।

কী বলার ছিল ওর?

আজও ঘোর এক আচ্ছন্নতার মধ্যে পড়ে আছে সে রোজ জ্যাঠামণি খবর নিচ্ছেন, অবশ্য নিজের পরিচয় গোপন রেখে।

যশোধরা আজও বাড়িতে কথা গোপন করতে শেখেনি। সে বাইরে যা যা ঘটেছে সবই বলে দেয় মা আর জেঠিমাকে। তোতনের খবরও সেই এসে প্রথম দেয়। নিজেও উদ্‌ভ্রান্তি ছিল যশোধরা। নিজেকে যে বারবার প্রশ্ন করেছে, আমার জন্যই হল না তো! আমি কি খুব নিষ্ঠুর মেয়ে?

নিষ্ঠুরই বোধহয়। নইলে তোতনের কথা দুচার মিনিট শুনতে পারত সে। আসলে পরস্ত্রীর সঙ্গে ওর অবৈধ সম্পর্ক আছে জেনে ফোভে দুঃখে এমন গরম হয়ে ছিল যশোধরা যে লোকটাকে দেখেই তার ভিতরে একটা কপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একটি পরিবারকে ভেঙে দিয়েছে লোকটা, দুটি মানুষের জীবন নষ্ট করেছে। এ লোকের সঙ্গে বিয়ে হলে যশোধরারই বা ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা কী?

ওই ঘটনা ঘটবার পর থেকে যশোধরার রাতের ঘুম গেছে, খাওয়ার রুচি গেছে, পড়ায় মনোযোগ গেছে। মরেই যেত। কী করে বেঁচে গেল কে জানে। ওইভাবে সাঙঘাতিক জখম হওয়ার পরও লোকটা উঠে দাঁড়াল রক্তমাখা শরীরে কি এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে আবার সমান বিপজ্জনকভাবে রাস্তা পেরোলো! কিভাবে সম্ভব? কোন জ্বালায় জ্বলেপুড়ে খাক হচ্ছে তোতন?

এই তো অলকদার খবর এল, তোতনের নামে যা রটনা হয়েছে তা রটনাই ঘটনা তেমন কিছু গুরুতর নয়।

তাহলে গোটা ঘটনার যোগফল কী দাঁড়ায়? শূন্য?

ওপরে যত তাচ্ছিল্যই দেখাক তার হতে পারত শাশুড়িকে খুব পছন্দ হয়েছিল যশোধরার। মহিলা তার মা-জেঠিমার মতোই। স্নেহশীলা হাস্যময়ী। আর যশোধরার বাড়ি থেকে বিয়ে ভেঙে দেওয়ায় দুঃখে নৈরাশ্যে ভদ্রমহিলা কী কাণ্ডই না করলেন। মাত্র পাঁচ মিনিটে যশোধরাকে এত আপন করে নিয়েছিলেন মহিলা।

যশোধরার ছোট্ট মাথায় এত কিছু হিসেব নিকেশ এটে ওঠে না, রাতে না ঘুমিয়ে সে অঝোরে কাঁদে না কাঁদলে বুকটা হালকা হতেই চায় না। মাঝে মাঝে নিশুত রাতে সে উঠে রাবান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকে। কোন লাভ হয় না তাতে। ভিতরের বিষাদ যেন অন্ধকার আলিঙ্গনেও ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা ওদের বড় ক্ষতি করলাম না!

সুনয়নী অত্যন্ত ক্লান্ত গলায় বলেন, তা করলাম মা। তবে ভবিতব্যই সব কিছু ঘটায়। আমাদের হাতে কি কিছু আছে। শুনতে পাচ্ছি, ওর মায়ের চেয়ে তোতনের অবস্থাই নাকি বেশি খারাপ। আহা রে, কী মায়াবী ছেলেটা।

জেঠিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, কলিযুগে ভালদের ওপরেই যেন ঠাকুরের বেশি কোপ।

সকালবেলায় ফোন বাজছিল। বাবা কাছারিঘরে। জ্যাঠামশাই বাজারে। যশোধরা গিয়ে ফোন ধরল।

কাকে চাই?

একটি সংকুচিত গলা বলল, এটা কি জয়নাথ অভয়নাথবাবুদের বাড়ি?

হ্যাঁ।

আমাকে হয়তো মনে নেই আপনাদের। আমরা সেই পাত্রপক্ষ ওই তোতনের দাদা আমি। দয়া করে কি অভয়নাথবাবুকে একটু দিতে পারেন?

ইঙ্কি বাজারে। কাঁপা গলায় যশোধরা বলে। কী ভীষণ কাঁপছে বুক। তাহলে জয়নাথবাবু?

কেন বলুন তো। কোনও খারাপ খবর আছে? আমি যশোধরা।
যশোধরা! ও! কী আশ্চর্য।
বলুন না কী হয়েছে!
আমি ফোন করছি অন্য কারণে। প্রত্যেকদিন একজন কেউ আমার মা আর তোতনের খবর নিচ্ছেন ফোনে। পরিচয় দিচ্ছেন না।
হ্যাঁ হ্যাঁ আমার জ্যাঠামশাই।
আমারও সেরকমই আন্দাজ ছিল। তাবে বলবেন তিনি খোঁজ নিচ্ছেন বলে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। শুধু এটুকু বলার জন্যই ফোন করলাম। ঘটনাক্রমে বিয়েটা ভেঙে গেল বটে, ত্তি এই সমবেদনার ব্যাপারটি আমাদের ভীষণ ভাল লেগেছে।
আমাদের ওপর আপনাদের রাগ নেই?
রাগ! রাগ কেন থাকবে? ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন।
শুনুন, উনি মানে তোতনবাবু কেমন আছেন?
বলুন না প্লীজ।
এখনও ডিলিরিয়াস। জ্বর এখনও অনেক। আর ইনজুরিও তো কম নয়।
গতকাল নার্সিং হোম-এ শিফ্‌ট্ করা হয়েছে।
উঃ!
কী হল আপনার?
না না, কিছু হয়নি। কী হবে! বলতে বলতেও চোখের জল্য বাঁ হাতে মুছবার চেষ্টা করল যশোধরা। কান্নার গলাতেই বলল, প্লীজ! ফোনটা ছেড়ে দেবেন না। আমার আর একটু কথা আছে।
আচ্ছা আপনি কি কাঁদছেন নাকি? ওঃ সত্যিই আপনারা দারুণ মানুষ। আমি ঠিক এরকম ফ্যামিলি দেখিনি।
আপনি আপনার বাড়ির খবর বলুন। আমরা সবাই ভীষণ অনুতপ্ত।
কেন, এতে আপনাদের তো কোনও ভূমিকা নেই। এখন আমাদের একটা খারাপ পেল চলছে। এরকম মাঝে মাঝে হয়।
আপনার মা?
মা অনেকটা ভাল। আউট অফ ডেনজার।
তার মানে কি তোতনবাবু আউট অফ ডেনজার নন?
না। দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে উই যেন লুজ হিম ফর এভার। সাইক্রিয়াট্রিস্ট সেরকমই একটা ভয় দেখিয়ে গেছে। মাথায় একটা সন্দেহজনক হেমাটোমা হয়ে আছে। স্ক্যানি-এর রিপোর্ট পেলে বোঝা যাবে।
আপনি কি জানেন যে এই ঘটনার জন্য আমিই দায়ী?
কী আশ্চর্য, আপনি কেন দায়ী হবেন? তোতনের তো উচিত হয়নি ওভাবে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করা।
উনি আমাকে কিছু বলতে গিয়েছিলেন।
হ্যাঁ জানি। বিয়েটা আপনারা ভেঙে দেওয়ার পর আমরা সবাই ওকে প্রচণ্ড অপমান করেছিলাম। মা ঠাকুরঘরে মাথা ঠুকে রক্তাক্ত করায় আমাদের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়েছিল। জানেন না বোধ হয় আমার ভাইটা ভীষণ নরম প্রকৃতির একটুতেই কেমন যেন হয়ে যায়। ওই প্রচণ্ড অপমান ও সহ্য করতে না পেরে কেমন যেন পাগলের মতো হয়ে যায়। তার ওপর ওপর ধারণা হয়েছিল ওর জন্যই মা ওরকম কাজ করলেন, আপনি কিন্তু ভীষণ কাঁদছেন।
আপনি বলুন।
আমি কিন্তু সত্যিই আপনাদের মতো মানুষ বিশেষ দেখিনি। এত দরদ আজকাল কারই বা থাকে বলুন।
প্লীজ। আপনি আমাদের প্রশংসা বন্ধ করুন।
আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু দয়া করে আপনার নিজেদের এ ব্যাপারে অপরাধী ভাববেন না। ওটা ঠিক হবে না। আপনি যে কেন এত কাঁদছেন। যশোধরা ঠাকুর আপনার মঙ্গল করবেন। দয়ালু লোকের কখনও অমঙ্গল হয় না।
প্লীজ! একটা কথা ---- আপনি ওদের আবার খবর নেবেন?
দেবো না কেন? নিশ্চয়ই দেবো।

রোজ দুবেলা?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আপনিও দরকার মতো ফোন করতে পারেন। আমাদের ফোনের লাইন জ্যান্ত আছে।

আমি করব। কিন্তু যদি অন্য কেউ ধরেন।

তাতে কি?

অন্যরা হয়তো আমার ওপর চটে আছেন।

হাসালেন এবার। কেউ চটে নেই। আপনার বাবা আর জ্যাঠমশাই স্বচ্ছন্দে গ্রামে ফোন করে খোঁজ নিতে পারেন। কেউ তাঁদের অপমান করবে না। বরং আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করছি।

প্লীজ! ছাড়বেন না কিন্তু। আপনি বাবার সঙ্গে কথা বলুন। এক্সটেনশন লাইন দিচ্ছি।

ফোনের টেবিলের সঙ্গেই কাছারিঘরের কলিংবেল আছে। সেটা টিপে দিল দাঁড়ানো। চোখের জন্য লুকোবার সুযোগ পেল না সে। কী লজ্জা!

কী হয়েছে রে? খারাপ কিছু?

বাঁচবে না, বড়মা।

কে ফোন করেছিল?

নোটন। বলল ডাক্তাররা আশা দিচ্ছে না।

সুচেতা একটা গভীর শ্বাস ফেললেন। হাত বাড়িয়ে বললেন, আয় আমার ঘরে আয়। ওরকম কাঁদতে নেই।

সুচেতা তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর আঁচলে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বুকে চেপে ধরলেন যশোধরাকে। মৃদুস্বরে বললেন নিজের দোষঘাট অত বড় করে দেখলে জীবনে চলতেই তো পারবি না। পদে পদে নিজেকে দায়ী করবি কেন? তোর চেয়ে অনেক বেশী দায়ী তো ওর বাড়ির লোকেরা। ওরা বকাঝকা করেছিল বলেই তো এরকম হল।

যদি মরে যায় তা হলে সারাটা জীবন আমি আর একদিনের জন্যও সুখী হতে পারব না বড়মা।

আচ্ছা,ওকথা এখন থাক। জীবন অনেক লম্বা রে। চুপ করে একটু শো দেখি। আজ বেরোতে দেবো না তোকে। তোর বাপজ্যাঠাকে আজ বিকেলেই আমি ওদের বাড়ি পাঠাচ্ছি।

আমিও যাবো বড়মা।

দুর পাগলি, তোর যেতে নেই।

একটা কথা বড়মা, ওরা আমাকে অপয়া ভাবছে না তো।

অপয়া! তুই অপয়া। ওরা কি অত আহাম্মক?

কিন্তু আমিও ভাবছি যে।

তুই শুয়ে পড় তো। আমি মাথায় একটা হাত বুলিয়ে দিই। চোখ বুজে ঠাকুরদের তার কথা ভাব।

লক্ষ্মী মেয়ের মতো শুয়ে পড়ল যশোধরা। চোখ বুজল। বুক কেঁপে একটা দীর্ঘশ্বাস আপনার থেকেই বেরিয়ে গেল তার। বাঁচিয়ে দাও ঠাকুর। এবারের মত বাঁচিয়ে দাও।

তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কী কথা বড়মা?

তোতন যদি বেঁচে ওঠে তা হলে ওকে বিয়ে করবি তো?

বিয়ে! বলে একারাশ বিস্ময় নিয়ে তাকায় যশোধরা, বিয়ের কথা কেন বলছো বড়মা! আমি তো বিয়ের কথা ভাবিইনি।

তাহলে কেন এত কাঁদছিস?

নয়?

মোটেই না বড়মা। আমার দোষে একটা লোক ওরকম জখম হল আমি শুধু সেইটেই ভুলতে পারছি না।

আর কিছু না?

আর কিছু না। তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি

থাক থাক। বিয়ে যদি আমরা এখানেই দিতে চাই?

এইসব যা হল, এরপর আমার বিয়ের ইচ্ছেটাই [illegible] গেছে। এ জন্যে বিয়ে না করলেও আমার চলবে। বড়মা, প্লীজ, কেঁদেছি বলেই কিন্তু ধরে নিও না যে, আমি তোমাদের তোতনের প্রেমে পড়ে গেছি

হুঁ, [illegible] আজকালকার মেয়েগুলো পাষাণ [illegible]ট। বুকগুলো কি পাথর দিয়ে গড়া?

না [illegible] তাহলে কি কাঁদতাম?

তাও বটে।

শোনে বড়মা ওভাবে আমাদের বিচার করতে যেও না। আমরা একটা অন্যরকম। তোমরা ঠিক বুঝবে না। আমাদের হৃদয় আছে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে একটা ক্যালকুলেটরও আছে। মালা বদলের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হৃদয় বদল হয় না।

চুপ কর মুখপুড়ি। ওসব শুনলেও পাপ হয়। আমি ভাবছিলুম কী ভাবছিলে বড়মা? মাত্র পাঁচ মিনিটের দেখায় একটা অচেনা অজানা ছেলের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে বসে আছি? তুমি যে কী একটা বোকা মেয়ে আমার! মাও ঠিক তোমার মতোই।

বোকাই রে! আমরা ভীষণ বোকা।

হ্যাঁ বোকা মিষ্টি আর ভাল। একটু ঘুমোই বড়মা?

যশোধরা ঘুমিয়ে পড়ল। সুচেতা ওর সুন্দর মুখখানার দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন, এরা সব কী ধাতুতে গড়া?

ওস্তাদ মিস্ত্রি যেমন মেরামত গাড়ির বটে চাপড়ে বলে, দেখে নিন স্যার, সব ঠিক আছে। মবিল লিক করছে না, তেলের ফ্লো কমিয়ে দিয়েছি স্পাক প্লাগ একদম নিউ সেই, ব্যাটারি ফুল চার্জ চাকা, পুরো রিট্রিড, বেক অয়েল গীয়ার অয়েল সব ঠিক আছে। এবার নিয়ে যান আপনার ময়ূরপঙ্খী-ঠিক সেরকম ভাবেই ডাক্তার একদিন তোতনের পিঠ চাপড়ে নোটনকে বলল, সব ঠিক আছে আর কোনও ভয় নেই। নো মেমরি লস, নো হেমাটোমা, নো ব্রে ড্যামেজ, নো ইনফেকশন, এবার ভাইকে নিয়ে যান।

এক ছায়াময় গভীর গহ্বর থেকে ধীরে ধীরে উঠে এসেছে তোতন। যেন ক্ষীণ পলকা একটা দড়ি বেয়ে। মাঝে মাঝে হড়কে গেছে হাত। মাঝে মাঝে দড়ি চেয়েছে ফেঁসে যেতে। এখনও মুখে ফ্যাকাসে ভাব। বাঁ হাতে এখনও ক্রেপ ব্যান্ডেজ। বারোদিন কাথা দিয়ে যে কেটে গেল। বারোটা দিন আয়ু থেকে টোটাল লস।

স্ট্রেচারে উঠতে চাইল না তোতন । না, আমি পারব। নোটন আর রতন একটু ধরে ধরে নামাল তাকে। গাড়িতে জায়গা হবে না বলে আর কেউ আসেনি। কিন্তু বাড়িতে সবাই অপেক্ষা করছে। মা বাবা দুই বোন আত্মীয়স্বজন।

বাড়ি-ফেরাটা বড্ড নাটুকে হয়ে গেল। সকলেরই চোখে জল। অনুতাপ। দোষ কবুল। তোতন কেবল ক্লান্ত হল, হাঁফিয়ে উঠল।

মাস খানেক বাদে ইন্টারন্যাশনাল টারমিন্যালে নিজের ঢাউস দুটো স্যুটকেস গলদঘর্ম হয়ে ট্রলি থেকে এক্সরে মেশিনে চাপিয়ে যখন তোতন টিকিটের লাইনে দাঁড়াল তখন ঠিক তার সামনের মধ্যবয়সী পিছনে ঘুরে বলল, আচ্ছা, ব্যারিকেডের বাইরে আপনি যে একটা ফর্সা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন, সে কি আপনার স্ত্রী?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কী নাম বলুন তো!

ক্যালকুলেটর।

অ্যাঁ!

সম্বিতা।

তাই বলুন। আসলে আমার একটি ছাত্রী ছিল ঠিক ওরকম দেখতে। তার নাম অবশ্য ছিল--- যাই হোক সম্বিতা নয়। এবং অবশ্যই ক্যালকুলেটরও নয়।

তোতন স্মিত মুখে চুপ করে রইল।

ভদ্রলোক হঠাৎ একটু নিচু হয়ে বললেন, আচ্ছা ক্যালকুলেটার কি কাঁদে?

না তো!

আপনার ক্যালকুলেটরকে তো আমি কাঁদতে দেখলাম।

দেখেছেন? নাকি গাই সত্যিই?

ডিস্টিংগুইশড। বেশ ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে। আপনি ততক্ষণ ব্যারিকেডে ঢুকে মালপত্র নিয়ে ব্যস্ত।

আমি গিয়ে এখন একটু দেখে আসব? একটা বেয়ার ব্যাপার তো? খরায় বৃষ্টি?

বাঃ আপনি রসিক লোক আছেন দেখছি। বাচা গেল। পথটা ভালই কাটবে। চলুন একসঙ্গে বসা যাক টিকিটটা আমাকে দিন আমি লন্ডন পর্যন্ত আপনি?

নিউ ইয়র্ক।

ভদ্রলোক টিকিট কাউন্টারের দিকে দু'কদম এগিয়ে বললেন, দুটো স্যুটকেস তুললেন দেখলাম কাটাতো আপনার, আর একটা নতুন বউ আমদানি চালান করলেন বুঝি?

সবই তো [illegible]।

জানি না মানে? আমার বউ তো তার গোটা শাড়ির স্টক আমার ঘাড়ে ফেলে আগাম পাঠিয়ে শেষে নাকি ঘরে লুঙি পরে থাকত।

দমাস করে হেসে ফেরে তোতন। নাঃ লোকটা জ্বালাবে। খুব হ্যাঃ হ্যাঃ করে হাসতে পারে বোধহয়।

লোকটা কাউন্টারে বোর্ডিং টিকিট নিয়ে বলল, নববিবাহিতদের আমার সবসময়ে বিবাহ বিষয়ক কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছে করে।

তা ইচ্ছে করুন। আমি টোটাল নভিস।

আহা হা লাউঞ্জে চলুন, একটু বীয়ার নিয়ে বসি।

আমার চলে না।

আরে ভয় পাচ্ছেন কেন, বউ অতদূর থেকে দেখতে পারে না, আড়ালে পড়ে গেছে।

তোতন মনে মনে একটা দীর্ঘ বোরডমের জন্য তৈরি হয়ে বলল, তা হলে দু-এক সিপ।

যথেষ্ট যথেষ্ট। হ্যাঁ, যা বলছিলাম মশাই কোনও কোনও বিয়ে আছে ঠিক যেন রিং-এর মধ্যে দুজন বকসার, এ ওকে দেখছে, ফেইন করছে, সরে যাচ্ছে টুকটাক মারছে। আর একরকম হল মোগলশিখের রণে মরণ আলিঙ্গনে কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আকড়ি দুইজনা দুইজনে। আর একরম আছে, যেন ঠিক দুজন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় টুকটাক টুকটাক এ মারছে ও ফেরত দিচ্ছে। চাপাস ওতর চাপান ওতর। অ্যাম আই ক্লিয়ার?

আপনি পাকা লোক দেখছি।

শুনুন মশাই ম্যারেজের কোনও পাকা কাঁচা নেই। এক গাড্ডা পাকা মাথা কাঁচা মাথা সব মাথাই ভুঁয়ে গড়াবে শেষ অবধি। ওই যে মুজতবা আমি সাহেব বলেছেন শাদীর পয়লা রাতেই মারবে বেড়াল, সেটাও আমি পরীক্ষা করে দেখেছি।

তোতন চোখ গোল গোল করে বলে, দেখেছেন?

আলবৎ। বাসরঘরে একটা বেড়াল নারকোল দুড়ি দিয়ে বাঁধা করিয়ে রেখেছিলাম। ঠিক মোমেন্ট ঝাড়ব। তবে ব্যাটা এমন শুরু করেছিল যে, সকলেরর আপত্তিতে ছেড়ে দিতে হল। আর একটা অসুবিধেও ছিল। আমার কাছে তলোয়ার ছিল না। কাটবো কি দিয়ে? হাও হাঃ হাঃ --- এই বেয়ারা--

তোতন শিউরে উঠল বাকি পথটার কথা ভেবে।

ক্যালকুলেটর যদি বলতে হয় মশাই তবে আমার বউকে সেভিংস স্কিম-এ টাকা রাখত, এমন এদেশে গ্যাট হয়ে বসেও ওইসব করছে। কি সব বেরিয়েছে না আজকাল-- সব সত্য অসত্য না, ধনরক্ষা, ধনবর্ষা, তারপর জীবনধারা না জীবনহারা হাঃ হাঃ হাঃ সেইসব গুচ্ছের কিনছে।

তোতন সিটিয়ে গেল।

বাই দা ওয়ে হঠাৎ ওই জীবনধারার কথায় আমার সেই ছাত্রীটির নাম মনে পড়ে গেল।

কোন ছাত্রীটি?

ওই যে বললুম না অনেকটা আপনার বউয়ের মতো দেখতে।

ওঃ হ্যাঁ।

তার নাম যতদূর মনে পড়ছে যশোধারা।

ওটা আমার স্ত্রীর বাপের বাড়ির নাম।

বাপের বাড়ির নাম? তাহলে ঠিক ধরেছি, এ সেই আমার ছাত্রী যশোধারাই!

তোতন একটু চিন্তায় পড়ল। সে যতদূর জানে তার স্ত্রী নাম যশোধারা নয়, যশোধরা। তবে খুব নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। আমেরিকায় গিয়েই ডিকশনারিটা দেখে নিতে হবে।

কিন্তু এ লোকটাকে কি করে সহ্য করবে তোতন? এ যে বিভীষিকা

একটা উপায় অবশ্য আছে। খুব বেশী বোর করলে সে চোখ বুজে যশোধরার মুখখানা ভাববে। মুখটায় একটাই প্লাস পয়েন্ট, বড় সুন্দর।

* * *

BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com